পঞ্চম অধ্যায়

ত্রৈলোক্যনাথ, রাজশেখর ও বলাইচাঁদের হাস্যরসের তুলনামূলক পর্যালোচনা

(১)

ত্রৈলোক্যনাথ, পরশুরাম ও বলাইচাঁদ একই সময়ে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হননি। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অগ্রবর্তী লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯)। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সেই যুগের বহু লক্ষণ তাঁর সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণভাবে প্রকাশলাভ করেছিল। পরশুরামের জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে। আর বলাইচাঁদের জন্ম হয় ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। অর্থাৎ ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে পরশুরামের জন্মের কালগত ব্যবধান প্রায় তেত্রিশ বছর। আবার পরশুরামের সঙ্গে বনফুলের জন্মের কালগত ব্যবধান প্রায় উনিশ বছর। আবার ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে বনফুলের এই ব্যবধান প্রায় বাহান্ন বছর। অর্থাৎ এই তিনজন লেখক তিন ভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সাহিত্য ক্ষেত্রেও তাঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন মোটামুটি একই সময়ের ব্যবধানে। কেননা ত্রৈলোক্যনাথের প্রথম রচনা 'কঙ্কাবতী' ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হবার প্রায় ত্রিশ বছর পর 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় বাংলা ১৩২৯, মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল রাজশেখর বসুর প্রথম ছোটগল্প 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'। এর আরও চোদ্দ বছর পর ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় বলাইচাঁদের প্রথম গল্পসংকলন 'বনফুলের গল্প'।

এই তিনজন লেখকের কেউই কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টিকে জীবন ধারণের মাধ্যম বা উপায় হিসেবে গ্রহণ করেননি। প্রত্যেকেরই স্ব স্ব জীবিকার জগৎ ছিল। ত্রৈলোক্যনাথ জীবনে বিচিত্র পেশা অবলম্বন করেছেন। ১৮ টাকা মাইনের সাধারণ স্কুল মাষ্টারের জীবন থেকে শুরু করে নানা পথ পেরিয়ে ভারত সরকারের বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি। কখনো চাকরী করেছেন রাজস্ব বিভাগে, আবার কখনো কলকাতা মিউজিয়ামে অ্যাসিষ্ট্যান্ট কিউরেটরের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। অন্যদিকে রাজশেখর বসু ছিলেন বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি **'বেঙ্গল কেমিকেলে'র** সর্বময় কর্তৃত্বের ভার গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘদিন এই স্বদেশী প্রতিষ্ঠানটির নানা কর্মকান্ডে নিজেকে যুক্ত রাখেন। আর বলাইচাঁদ ছিলেন পেশায় চিকিৎসক। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আজিমগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি হাসপাতালে চাকরীতে যোগদান করেন। পরে ভাগলপুরে এসে ভাগলপুর প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরী নির্মাণ করে স্বাধীনভাবে ডাক্তারী শুরু করেন। আজীবন তিনি এই পেশায় নিজেকে নিযুক্ত রাখেন।

ত্রৈলোক্যনাথ এবং রাজশেখর বসু উভয়েরই প্রকৃত সাহিত্য জীবন শুরু হয় কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর। ত্রৈলোক্যনাথ চাকরী জীবন থেকে অবসর নেন ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। 'কঙ্কাবতী' (১৮৯২) ছাড়া তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলি সবই তিনি রচনা করেছিলেন চাকরী জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করার পর। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলির প্রকাশকাল এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে :

'ভূত ও মানুষ' (১৮৯৬), 'ফোকলা দিগম্বর' (১৯০১), 'মুক্তামালা' (১৯০১), 'ময়না কোথায়' (১৯০৪), 'মজার গল্প' (১৯০৬), 'পাপের পরিনাম' (১৯০৮) এবং 'ডমরু চরিত' (১৯২৩)।

রাজশেখর বসু অবসর গ্রহণ করেন ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে। **'গড্ডলিকা'**(১৯২৪) ও **'কজ্জলী'** (১৯২৮) ছাড়া তাঁরও সমস্ত গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয় চাকরী থেকে অবসর নেওয়ার পর। প্রকৃতপক্ষে কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পরই তিনি পুরোপুরিভাবে সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। এই সময় থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি আরও প্রায় ৭টি গল্পগ্রন্থ উপহার দেন বাংলা সাহিত্যকে। এই গল্পগ্রন্থগুলি হল **'হনুমানের স্বপ্ন'**, (প্রথম সংস্করণ, ১৩৩৪, ২য় সংস্করণ ১৩৫০), **'গল্পকল্প'** (১৩৫৭), **'ধুস্তুরী মায়া ইত্যাদি গল্প'** (১৩৫৯), **'কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প'** (১৩৬০), **'নীলতারা ইত্যাদি গল্প'** (১৩৬৩), **'আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প'** (১৩৬৪), **'চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প'** (১৩৬৬)।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও রাজশেখর বসু উভয়েই একটু বেশী বয়সে সাহিত্য রচনা শুরু করলেও বনফুল কিন্তু সাহিত্য রচনা শুরু করেন নিতান্ত ছাত্রাবস্থা থেকেই। বলাইচাঁদের বয়স যখন ১৩-১৪ বৎসর তখন তিনি **'ময়ূর'** নামে একটি কবিতা লেখেন। তিনি যখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র তখন তিনি হাতে লেখা একটি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেন এবং নাম দেন **'বিকাশ'**। বলাইচাঁদের সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ শুরু হয়েছিল এই **'বিকাশ'** পত্রিকাতেই। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'মালঞ্চ' পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে তিনি সাহিত্য জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র লাভ করেন। এরপর কলকাতায় মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়তে এসে কলেজের মাসিক পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। মেডিকেল কলেজে পড়বার সময়ই গল্প লেখায় তাঁর হাতে খড়ি হয়েছিল। এই সময় তিনি অনেকগুলি গল্প লিখেছিলেন। ১৩২৯ সালের ভাদ্র সংখ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁর লেখা **'পাখী'** নামক গল্পটি প্রকাশিত হয়। **'চোখ গেল'** গল্পটি প্রকাশিত হয় ঐ বছরের আশ্বিন সংখ্যায়। বলাইচাঁদের ছোটগল্পের প্রথম সংকলন **'বনফুলের গল্প' ১৯৩৬** খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর তিনি একে একে ৩৫টি গল্পগ্রন্থ (সংকলন গ্রন্থ সহ) উপহার দেন বাংলা সাহিত্যকে।

(২)

শিল্পী ব্যক্তিত্বের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যায় ত্রৈলোক্যনাথের ছিল একটি অনুভূতিশীল মন। দীনবন্ধুর মতই তাঁর সামাজিক অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। এই সামাজিক অভিজ্ঞতাই সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁর প্রধান অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। তাঁর জীবনী থেকে জানা যায় তিনি ছিলেন বহুদর্শী একজন মানুষ। তাঁর পুথিগত বিদ্যা খুব বেশী ছিল না। মাত্র অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত তিনি পড়াশুনা করেছেন। পুথিগত বিদ্যায় বেশীদূর অগ্রসর না হয়েও নানা বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তিনি :

> ''বহু সমসাময়িক ইংরেজী উপন্যাস পড়তেন, Popular Science জাতীয় গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকায় আসক্তি ছিল। Odehouse, Lewis carrol, Arther Conan Doyle, Mark Twain, Dickens- এদের রচনা তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল।'' [১ক]

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর গভীর পর্যবেক্ষণশক্তি। তবে যে পরিমাণে তাঁর পর্যবেক্ষণশক্তি ছিল সে পরিমাণে উঁচুদরের কল্পনাশক্তির অধিকারী তিনি ছিলেন না। একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠত্ব অনেকটাই নির্ভর করে তাঁর কল্পনাশক্তির উপর। সামাজিক অভিজ্ঞতা তাঁর প্রচুর থাকলেও যে কল্পনাশক্তি দ্বারা লেখক নির্মাণ করেন এক অপূর্ব মায়ার জগৎ সে শক্তি ত্রৈলোক্যনাথের কোথায়? একথা অস্বীকার করা যায় না যে ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের জগতে আজগুবির ছড়াছড়ি, বাস্তবের ঊর্ধ্বচারী নানা আতিপ্রাকৃতের উপস্থিতি। যে লেখক কল্পনার পাখা বিস্তার করতে করতে সহজেই পৌঁছে যান আকাশের উপরিতলে অথবা জলের গভীরে, সেখানে গিয়ে তিনি অবলীলায় যতখুশি আকাশের তারাকে ব্যগবন্দী করেন অথবা জলের গভীরে গিয়ে মশার সঙ্গে সখী সম্পর্ক পাতান সেই লেখকের যে কল্পনা ক্ষমতা অপরিসীম সে কথা স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় এ কল্পনা অনেকটাই শিশুমনের উপযোগী হয়ে উঠেছে। এ কল্পনা ক্ষণিক মন ভোলানোর সামগ্রী হতে পারে কিন্তু দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে তাঁর আবেদন কিন্তু একই রকম নয়। যে কল্পনাশক্তির প্রাচুর্য থাকলে শিল্পের চূড়া স্পর্শ করা যায় সে কল্পনা প্রতিভার পরিচয় ত্রৈলোক্যনাথে কিন্তু পাওয়া যায় না। প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন :

> ''পর্যবেক্ষণশক্তি যেমন ত্রৈলোক্যনাথের প্রচুর পরিমাণে ছিল কল্পনাশক্তি তেমন ছিল না। বস্তুত দিব্য কল্পনাশক্তির যেন তাঁহার কিছু অভাব ছিল। আর কল্পনাশক্তির

প্রাচুর্য ব্যতীত কেহই শিল্পের চূড়া স্পর্শ করিতে পারে না। শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ শিল্পীরও প্রচুর কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। সত্য বলিতে কি, অনেক সময়েই দেখা যায় শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গশিল্পীগণ উঁচুদরের কবিও বটে—যেমন মলিয়ের, অ্যারিস্টফেনিস এবং হায়নে। এই কল্পনাশক্তির অভাবেই তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গশিল্পীদের অন্যতম হইতে পারেন নাই, শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি ব্যঙ্গশিল্পী মাত্র হইয়া আছেন।''[১খ]

রাজশেখর বসু ত্রৈলোক্যনাথের মত বহুদর্শী ছিলেন না। পরশুরাম নিজেই জানিয়েছেন সে কথা :

''জীবনে আমি খুব কম লোকের সঙ্গে মিশেছি। তাই আমার অভিজ্ঞতাও খুবই কম। কর্মক্ষেত্রে যাদের সঙ্গে মিশেছি তাদের মধ্যে বেশিরভাগ ব্যবসায়ী আর দোকানদার। লিখতে গেলে অনেক বেশী দেখতে হয়। আমার যা দেখার তা ঐ রামায়ণ-মহাভারত, পুঁথিপত্রের মধ্য দিয়ে দেখা।''[২ক]

সামাজিক অভিজ্ঞতা কম থাকলেও তাঁর যে পরিমান দূরদৃষ্টি ছিল বা কল্পনাশক্তি ছিল তা ছিল না ত্রৈলোক্যনাথের। তাই জীবনের একটি বৃহৎ অংশ বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে কাটালেও মানুষ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা কম হয়নি। ত্রৈলোক্যনাথের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন অভিজ্ঞতা রাজশেখরের ছিল না। রাজশেখর ছিলেন মিতবাক, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। পরিমল গোস্বামী তাঁর ব্যক্তিত্বকে খেজুর গাছের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন :

''রাজশেখরকে খেজুর গাছের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ভিতরে কোষে কোষে রস, কিন্তু বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই। কেটে, চেঁচে, বুকে হাঁড়ি বেঁধে, তবে তা থেকে রস সংগ্রহ করতে হয়।''[২খ]

তবে ছেলেমানুষী করতে ভালোবাসতেন। রাজশেখরের দৌহিত্র দীপঙ্কর বসু জানিয়েছেন যে তাঁর অবসর সময় কাটতো বই পড়ায় বা হাতের কাজে। এহেন রাজশেখরের মধ্যে যে রসিক সত্তা নিহিত ছিল তার প্রমান তাঁর ছোটগল্পগুলি।

কিন্তু বলাইচাঁদের সাহিত্য প্রতিভায় ত্রৈলোক্যনাথের সামাজিক অভিজ্ঞতা ও রাজশেখরের কল্পনা উভয়েরই মিশ্রণ হয়েছিল। ছেলেবেলায় মনের আনন্দে নিজের গ্রাম মণিহারীর আশে পাশে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন বনফুল। মুক্ত প্রকৃতির প্রতি এই আকর্ষণ তাঁর লেখক জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ছাত্রজীবনে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়তে এসে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল বলাইচাঁদের। কয়েকদিন শ্যাওড়াফুলি থেকে ডেইলি প্যাসেঞ্জারীও করেছিলেন। পরে মির্জাপুর স্ট্রীটে এক মেসে থেকেছেন তিনি। আবার কর্মজীবনে চিকিৎসক হিসেবে তিনি বহু বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন। এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা বনফুলের সাহিত্যকে আলাদা মাত্রা

এনে দিয়েছে। এর সঙ্গে বলাইচাঁদের প্রতিভা যুক্ত হয়ে এক বিচিত্র গল্পের স্বাদ তৈরী হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বনফুলের নিজেরই মন্তব্য :

> ''সমাজে যখন ঘোরাঘুরি করি তখন নানা রকম নরনারী দেখতে পাই। তাঁদের ছাপ আমার মনের উপর পড়ে। শুধু পড়ে না, কল্পনারসে জারিত হয়ে সেগুলি চিত্ররূপে রাখা থাকে আমার মনের অবচেতনলোকে। এই নেপথ্যবাসী কবি যখন গল্প সৃষ্ট করতে চান তখন সেই চিত্রশালা থেকেই তিনি চিত্র সংগ্রহ করেন।...মনের নেপথ্যকামী সেই কবিসত্তার মর্জির ওপরই নির্ভর করতে হয় আমাকে। তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় কি তা জানি না। তাঁকে প্রতিভা বলতে পারেন, ভগবানও বলতে পারেন।''[৩]

(৩)

বিষয়বস্তু নির্বাচনের দিক থেকে এই তিনজন গল্পকারের তুলনা করলে দেখা যায় ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের বিষয়বস্তুর তুলনায় পরশুরামের গল্পবিষয়ের বৈচিত্র্য অনেক বেশী। আর এদিক দিয়ে বলাইচাঁদ পরশুরামেরই সার্থক উত্তরাধিকারী। এ ক্ষেত্রে বলাইচাঁদ পরশুরামকেও ছাপিয়ে গেছেন। বলাইচাঁদ নিজেই লিখেছেন :

''আমার একটা স্বভাব, আমি একঘেয়ে ব্যাপার বেশীদিন বরদাস্ত করতে পারি না। উপর্যুপরি একইরকম তরকারী খাইতে পারি না।''[৪] গল্পলেখার সময়ও এই স্বভাব বলাইচাঁদকে তাড়িত করেছে। তাই তাঁর গল্পের উদ্যানে বহু বিচিত্র বর্ণের ফুলের সমাহার ঘটেছে। ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, যুদ্ধ, স্বদেশ ভাবনা, অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার, প্রেম ও দাম্পত্য ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে পরশুরাম গল্প রচনা করেছেন। বনফুলও তাঁর বিভিন্ন গল্পে মানুষের নানা কুসংস্কার, বিচারবোধহীনতা, রাজনৈতিক নেতার ভন্ডামি এবং মানুষের নানা অসঙ্গতিকে তুলে ধরেছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর ডাক্তারি অভিজ্ঞতাপ্রধান গল্পগুলি। সাধারণভাবে হাস্যরসের শিল্পী যতটা সমাজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ভাবিত হৃদয়গত সমস্যা নিয়ে ততটা নন। সমাজের গভীরতম সমস্যা ও অসঙ্গতিগুলি গভীরভাবে এদের মনোজগতে আলোড়ন তোলে। আর তার প্রকাশ ঘটে সাহিত্যে। এদিক দিয়ে এই তিনজন লেখকের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। বলাইচাঁদ সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :

> ''কোন হৃদয়-জটিলতার ফাঁকে তিনি ধড়া পড়েন নাই বলিয়া তাঁহার মনোভাবের মধ্যে ক্ষীণ ঔৎসুক্যপূর্ণ নিরপেক্ষতাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। জীবনের দুর্বোধ্যতার তিনি

কোন ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন নাই, উদার দৃষ্টি দিয়া ইহার বিসর্পিত বিস্তারকে লক্ষ্য করিয়াছেন। মানুষের অন্তরের জটিলতা নহে, সমাজব্যবস্থার দুর্বোধ্য ও দুরতিক্রম্য প্রভাব, জীবনদৃশ্যের নানা অতর্কিত বিকাশ ও বর্ণবৈচিত্র্য তাঁহার বর্ণনাশক্তি ও বিশ্লেষণ প্রবণতাকে উদ্রিক্ত করিয়াছে।''[৫]

তিনজন গল্পলেখকই জীবনের অসঙ্গতিটুকু ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে গল্পে তুলে ধরেছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধায় বনফুলের গল্প সম্পর্কে বলেছেন :

''কথামালা, হিতোপদেশ প্রভৃতি প্রাচীন গল্পসংগ্রহে যেমন গল্পের নীতিকথাটুকুই লেখকের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, আধুনিক যুগের বনফুলের গল্পে তদনুরূপ ব্যঙ্গাত্মক অসঙ্গতিটুকু ফুটাইয়া তোলাই যেন গল্পরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য দাঁড়াইয়াছে।''[৬]

এ কথা ঠিক ত্রৈলোক্যনাথ, পরশুরাম ও বলাইচাঁদ এই তিনজনের গল্পবিষয়ের বহু সাদৃশ্য চোখে পড়ে। চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয় ও চিকিৎসকদের নানা অসঙ্গতিকে কেন্দ্র করে তিনজনই গল্প লিখেছেন। ত্রৈলোক্যনাথ যেমন লিখেছেন 'চঞ্চলা গাইগরু', তেমনি পরশুরাম লিখেছেন 'যদুডাক্তারের পেশেন্ট' ও 'চিকিৎসা সংকটের' মত গল্প। ত্রৈলোক্যনাথের 'চঞ্চলার গাইগরু' গল্পে কোমর সমেত পা ধড় থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পরও কীভাবে ডমরুধরের শরীরের সঙ্গে গরুর পা ও কোমর জুড়ে দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তুলেছেন সে কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। আর পরশুরামের 'যদু ডাক্তারের পেশেন্ট' গল্পে পরশুরাম দুজন নারী পুরুষের ধর থেকে মুন্ড আলাদা হয়ে যাওয়ার পরেও তাদেরকে বাঁচিয়ে তোলার গল্প শুনিয়েছেন। শুধু তাই নয় সমস্তরকম ডাক্তারী কোডকে অবজ্ঞা করে একজনের ধরে আরেকজনের মুন্ডু জুড়ে দিয়েছেন। আর প্রায় একই বিষয় নিয়ে বলাইচাঁদ লিখেছেন 'হনুমান সিং', 'নাথুনির মা', 'চেহারা বদল' ইত্যাদি গল্প। তিনজনই সাধু সন্ন্যাসী, জ্যোতিষী শ্রেণীর মানুষের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করে গল্প লিখেছেন। ত্রৈলোক্যনাথের অমাবস্যা বাবাজী, পরশুরামের বিরিঞ্চিবাবা অথবা খল্বিদং স্বামী, বনফুলের 'ঘরে বাইরে' গল্পের ভন্ড জ্যোতিষী তো একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

অতিপ্রাকৃত বিষয় তিনজনেরই গল্পের বিষয় হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথের তো প্রায় সব গল্পেই অতিপ্রাকৃতের উপস্থিতি। তাঁর খুব কম গল্পই পাওয়া যায় যেখানে অতিপ্রাকৃতের আভাস নেই। পরশুরামেরও কিছু গল্প রয়েছে যেখানে রয়েছে অলৌকিক অনুভূতি। ভূত, প্রেত ইত্যাদি উপাদান নিয়েই রচিত হয়েছে এই গল্পগুলি। তাঁর 'ভূষন্ডীর মাঠে', 'মহেশের মহাযাত্রা', 'বদন চৌধুরীর শোকসভা' ইত্যাদি গল্পগুলি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। সরাসরি ভূতপ্রেত না হলেও অতিপ্রাকৃতের আভাসযুক্ত গল্প বনফুলও লিখেছেন যে গল্পগুলির

মাধ্যমে মানুষের অলৌকিক সংস্কারকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এ গল্পগুলির মধ্যে 'বাঘা', 'বিদ্যাসাগর', 'ফ্রেমে বাধানো কার্ড বোর্ড', 'রাত দুপুরে, 'অবর্তমান', 'নন্দী খ্যাপা' ইত্যাদি গল্প উল্লেখযোগ্য। তবে ব্যক্তিগত জীবনে ত্রৈলোক্যনাথ বা পরশুরাম কতটা অলৌকিকতায় বিশ্বাস করতেন তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। কিন্তু বলাইচাঁদ ব্যক্তিগত জীবনে অলৌকিতায় আস্থাবান ছিলেন বলেই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন যে সে ভূত বিশ্বাস করে কিনা? উত্তরে বনফুল বলেছিলেন : ''করি। আমি যখন মেডিকেল কলেজে পড়ি তখন একবার ভূত দেখেছিলাম।''[৭] এই বিশ্বাস থেকেই তিনি হয়তো লিখেছিলেন 'অবর্তমান', 'ছাত্র', 'কেন', 'শেষ কিস্তি', 'নন্দী ক্ষ্যাপা' 'প্রমাণ' ইত্যাদি গল্প। এ সমস্ত গল্পে অলৌকিকতা রয়েছে। কিন্তু এগুলি নিছকই ঘটনা। যখন অলৌকিকতা নিছক ঘটনা হিসেবে থেকেছে তখন বনফুল তাকে সেভাবেই বিবৃত করেছেন কিন্তু অলৌকিকতা যখন সমাজকে এবং ব্যক্তির জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে তখন বনফুল তাকে ব্যঙ্গ করেছেন।

তিনজন লেখকই ঠকচরিত্রকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে গল্প লিখেছেন। এ বিষয়ে ত্রৈলোক্যনাথ যেমন ডমরু চরিত্রের স্রষ্টা, তেমনি পরশুরামেরও অমর সৃষ্টি শ্রী শ্যামানন্দ ব্রম্মচারী। এরা দুজনেই লোক ঠকানোতে ওস্তাদ। দুজনেই প্রচুর মানুষকে ধাপ্পা দিয়ে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করেছেন। ডমরুধর বিশ্বাস করেন ''টাকায় কি না হয়।''। লোক ঠকানোতে তার জুড়ি মেলা ভার। তার ঠকবাজির থেকে কেউই নিস্তার পায়নি। সাধুবাবা থেকে আরম্ভ করে বি.এ এম. এ পাস শিক্ষিত মানুষ এমনকি যমকেও তিনি ঠকিয়েছেন। হ্যান্ড নোট লিখতে বসে তিনি মনে মনে ভাবেন, ''যত পার হ্যান্ডনোট লিখিয়া লও। উপুর হস্ত কখনো আমি করিব না। নালিশ করিবে? ডিক্রি করিবে? ডিক্রি ধুইয়া খাইও। কি বেচিয়া লইবে বাপু?'' লোক ঠকানোর জন্যই তিনি স্বদেশী কোম্পানী খোলেন। এবং সেই কোম্পানীর নামে প্রচুর শেয়ার বিক্রি করেন। পরে কোম্পানীর লোকসান দেখিয়ে প্রচুর টাকা আত্মসাৎ করেন। এমনকি এ কাজে তার প্রধান সঙ্গী শঙ্কর ঘোষকেও কিছুই ভাগ দেন না। এরকম ঠক চরিত্র সত্যিই বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। পরশুরামের শ্যামবাবুও ঠকবাজিতে প্রায় ডমরুধরের সমধর্মী। ত্রৈলোক্যনাথ ডমরুধরকে অত্যন্ত চাছাছোলাভাবে অঙ্কণ করেছেন কিন্তু পরশুরাম শ্যামবাবু চরিত্রটিকে নির্মাণ করেছেন ভদ্রতার মুখোশ পরিয়ে। শ্যামবাবু তাঁর সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন: ''ধর্মই হিন্দুগণের প্রাণস্বরূপ। ধর্মকে বাদ দিয়া এ জাতির কোনও কর্ম সম্পন্ন হয় না। অনেকে বলেন—ধর্মের ফল পরলোকে লভ্য। ইহা আংশিক সত্য মাত্র। বস্তুত ধর্মবৃত্তির উপযুক্ত প্রয়োগে ইহ লৌকিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ উপকার হইতে পারে।'' ('শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড') দেশবাসীর ধর্মের প্রতি এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে খুব সুচারুভাবে 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' নামে একটি স্টক

কোম্পানী খুলেছেন। সেখানে সমাজের অভিজাত মানুষদেরও সেই স্টক কোম্পানীর অংশীদার করেছেন এবং সব শেষে সব টাকা আত্মসাৎ করে শ্যামানন্দ কেটে পড়েছেন। শ্যামানন্দর লোক ঠকানোর ভঙ্গী ডমরুধরের কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়। 'পাকারুই' গল্পের নীলমাধব, 'মাত্র দশটি টাকা' গল্পের নিখিলবাবুও ঠক চরিত্র হিসেবে কম উল্লেখযোগ্য নয়। 'পাকা রুই' গল্পের নীলমাধব একই সঙ্গে ঠক এবং নিষ্ঠুরও বটে। বাইরে নীলমাধবকে দেখে তার ভেতরে যে এত বড় ভন্ডামী লুকিয়ে রয়েছে তা বোঝার উপায় ছিল না। ''বোঝবার উপায় ছিল না যে, সে ছেলেবেলায় পিতৃমাতৃহীন হয়ে দূর-সম্পর্কের পিসের বাড়িতে মানুষ হয়েছিল, বোঝবার উপায় ছিল না যে, সে আই-এ ফেল, বোঝবার উপায় ছিল না যে, সে বেকার, বোঝবার উপায় ছিল না যে, ওই পিসের গলগ্রহ থেকেও সে একটা যক্ষ্মাগ্রস্ত মেয়েকে বিয়ে করে তার গর্ভে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে উৎপাদন করেছে। কিছু বোঝবার উপায় ছিল না।'' পুত্রের মৃত্যুও তাকে বিশেষ বিচলিত করতে পারে না। এমনকি স্ত্রী যখন মড়তে বসেছে তখনও সে অনায়াসে প্রেমে পড়তে পারে এমনকি স্ত্রীর মৃত্যুর পর সকলকে ঘর থেকে বের করে শোকযাপনের আছিলায় স্ত্রীর গায়ের সমস্ত গয়না খুলে নিয়ে গিয়ে সরে পড়ে এবং তা দিয়ে পাঁচশো টাকা দিয়ে একটি ভালো নেকলেস কিনে নিয়ে প্রেমিকাকে উপহার দেয়। ত্রৈলোক্যনাথ ডমরুধর এঁকেছেন, পরশুরাম শ্যামানন্দ এঁকেছেন কিন্তু নীলমাধব আধুনিক ভন্ডামির একেবারে পার্ফেক্ট টাইপ।

ভূতপ্রেতে বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে তিনজন গল্পলেখকই গল্প রচনা করেছেন। এরকম বিষয় নিয়ে রচিত গল্পে ত্রৈলোক্যনাথের অবস্থান বাস্তবের অনেক ঊর্ধ্বে। অন্যদিকে পরশুরাম ও বনফুলের গল্প উপস্থাপন বাস্তবের অনেক কাছাকাছি। ত্রৈলোক্যনাথ যেখানে ফ্যানটাসির কাছাকাছি সেখানে পরশুরাম ও বনফুলের গল্প অনেকটাই বাস্তবতার উপর নির্ভরশীল। এ ধরণের গল্পরচনায় পরশুরাম ও বনফুল অনেকটাই কাছাকাছি। পরশুরামের 'মহেশের মহাযাত্রা' ও বনফুলের 'মড়াটা' গল্পদুটি আলোচনা করলেই এ বক্তব্যের সমর্থন মেলে। ভূত প্রেতে অবিশ্বাসী বন্ধুকে জোড় করে ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করাতে গিয়ে তাদের বন্ধুরা কৃত্রিম আয়োজন করেছিল এবং কীভাবে সে আয়োজন ভেস্তে গিয়ে তাদের সব চালাকি ধড়া পরে গিয়েছিল সে কথা অত্যন্ত কৌতুকসহকারে দুটি গল্পে বর্ণিত হয়েছে। 'মহেশের মহাযাত্রা' গল্পে ভূতপ্রেতে অবিশ্বাসী বন্ধুর ভূমিকায় রয়েছে অঙ্কের অধ্যাপক মহেশ মিত্তির। অন্যদিকে 'মড়াটা' গল্পে রয়েছেন অমল, মেডিকেল কলেজের ছাত্র। মহেশ মিত্তির ও অমল দুজনের কেউ কখনও ভূত দেখেনি। তাই তারা ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু তাদের বন্ধুরা নাছোরবান্দা। তারা অবিশ্বাসী বন্ধুকে ভূত দেখাবেনই। শুরু হল আয়োজন। এ প্রসঙ্গে পরশুরামের গল্পে উল্লেখ আছে:

''শিব-চতুর্দশীর রাত্রে মহেশ মিত্তির আর হরিনাথ কুন্ডু মাণিকতলায় গেলেন। জায়গাটা তখন বড়ই ভীষণ ছিল, রাস্তায় আলো নেই, দুধারে বাবলা গাছে আরও অন্ধকার করেছে। সমস্ত নিস্তব্ধ, কেবল মাঝে মাঝে প্যাঁচার ডাক শোনা যাচ্ছে। হোঁচট খেতে খেতে দুজনে নতুন খালের ধারে পৌঁছলেন। বছর-দুই আগে ওখানে প্লেগের হাসপাতাল ছিল, এখনও তার গোটা দুই খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে।

মহেশ মিত্তির অবিশ্বাসী সাহসী লোক, কিন্তু তাঁরও গা ছমছম করতে লাগল। হরিনাথ সারা রাস্তা কেবল ভূতের কথাই কয়েছেন—তারা দেখতে কেমন, মেজাজ কেমন, কি খায়, কি পরে। দেবতারা হচ্ছেন উদার প্রকৃতি দিলদরিয়া, কেউ তাঁদের না মানলেও বড় একটা কেয়ার করেন না। কিন্তু অপদেবতারা পদবীতে খাটো ব'লে তাদের আত্মসম্মানবোধ বড়ই উগ্র, না মানলে ঘাড় ধরে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা আদায় করেন। এই সব কথা।

হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ শোনা গেল, যেন কোনও অশরীরী বেরাল তার পলাতকা প্রণয়িণীকে আকুল আহ্বান করছে। একটু পরেই মহেশবাবু রোমাঞ্চিত হয়ে দেখলেন, একটা লম্বা রোগা কুচকুচে কাল মূর্তি দু-হাত তুলে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে একটু দূরে ঐরকম আরও দুটো।

হরিনাথবাবু থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—'রাম রাম সীতারাম! ও মহেশ দেখছ কি, তুমিও বল না।'

আর একটু হলেই মহেশবাবু রামনাম উচ্চারণ ক'রে ফেলতেন, কিন্তু তাঁর কনশেন্স বাধা দিয়ে বললে—'উহু, একটু সবুর কর, যদি ঘাড় মটকাবার লক্ষণ দেখ তখন না-হয় রামনাম করা যাবে।'

এঁরা একটা পাঁকুর গাছের নীচে ছিলেন। হঠাৎ ওপর থেকে খানিকটা কাদাগোলা জল মহেশের মাথায় এসে পড়ল।

তখন সামনের সেই কাল মূর্তিটা নাকী সুরে বললে—'মহেশবাবু, আপনি নাকি ভূত মানেন না?

এ অবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই বলে থাকেন—আজ্ঞে হাঁ, মানি বইকি। কিন্তু মহেশ মিত্তির বেয়াড়া লোক, হঠাৎ তাঁর কেমন একটা খেয়াল হল, ধাঁ করে এগিয়ে গিয়ে ভূতের কাঁধ খামচে ধ'রে জিজ্ঞাসা করলেন—'কোন ক্লাস?'

ভূত থতমত খেয়ে জবাব দিলে—'সেকেন্ড ইয়ার সার!'

রোল নম্বর কত?'

ভূত করুণ নয়নে হরিনাথের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—বলি সার?'

হরিনাথের মুখে রাম রাম ভিন্ন কথা নেই। পিছনের দুটো ভূত অদৃশ্য হয়ে গেল। পাকুড় গাছে যে ছিল সে টুপ করে নেমে এসে পালিয়ে গেল। তখন বেগতিক দেখে সামনের ভূতটি ঝাঁকুনি দিয়ে মহেশের হাত ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড় মারলে।

মহেশ মিত্তির হরিনাথের পিঠে একটা প্রচন্ড কিল মেরে বললেন—'জোচ্চোর!'

হরিনাথও পাল্টা কিল মেরে বললেন—'আহম্মক!'

নিজের নিজের পিঠে হাত বুলতে বুলতে দুই বন্ধু বাড়ি-মুখো হলেন। আসল ভূত যারা আশেপাশে লুকিয়ে ছিল তারা মনে মনে বললে—আজি রজনীতে হয়নি সময়।''[৮]

অন্যদিকে বনফুলের গল্পে:

''অমল। না আমি ভূত বিশ্বাস করি না।

জীবেন। বিশ্বাস না করার মানে? অনাদিকাল থেকে পৃথিবীর সব দেশের সব সমাজের সব স্তরের লোক যা বিশ্বাস করে সেটা কি ভুয়ো হতে পারে? তোমার অবিশ্বাসের হেতু কি?

অমল। আমি নিজে কখনও দেখিনি—

জীবেন। তুমি কি নিজে কখনও সুইজারল্যান্ড আইল্যান্ড দেখেছ? ওগুলো নেই? মাইক্রোসকোপ আবিষ্কার হবার আগে কি কেউ ব্যাকটেরিয়া দেখেছিল, তা বলে কি ওগুলো ছিল না?

কানু। হয়তো একদিন কেউ ভূতোস্কোপ আবিষ্কার করবে তখন দেখা যাবে যে আমাদের চারদিকে ভূত কিলবিল করছে।

অমল। যত সব বাজে কথা।

কানু। আমার কিন্তু ভাই গা ছম ছম করছিল—এটা বাজে কথা নয়।

জীবেন। আজ যে বডিটা এসেছে দেখেছিস? কালো মুসকো, ষন্ডা চেহারা, দু'গাল ভরতি কাঁচা-পাকা দাড়ি, প্রকান্ড চোখ, দাঁতগুলো বেড়িয়ে আছে মনে হচ্ছে যেন হাসছে, ওটাকে দেখে আমারও গা ছমছম করছিল। ওটাতে কাদের পার্ট পড়বে কে জানে? মনে হয় ওর গায়ে ছুরি বসালে ও লাফিয়ে উঠে কামড়ে দেবে—বাবা কি চেহারা!

অমল। আমিও দেখেছি, আমার কিন্তু ভয় করে নি। মড়া মড়া, তাকে আবার ভয় কি?

জীবেন। রাত বারোটার সময় অন্ধকারে একা অ্যানাটমি হলে ঢুকে ওটার কপালে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিয়ে আসতে পার?

অমল। অনায়াসে পারি।

জীবেন। কক্‌খনো পারবে না।

অমল। নিশ্চয় পারব—

জীবেন। আমি বাজি রাখতে পারি, পারবে না। দিনের আলোয় বসে ওরকম লম্বাই চওড়াই সবাই করতে পারে।

অমল। বেশ, রাখ বাজি, কত দেবে?

জীবেন। দশ টাকা।

অমল। বেশ।

জীবেন। আজ রাত্রি বাড়োটার পর আমরা তোমাকে মেস থেকে বার করে দেব। মুন্না ডোমকে দুটো টাকা দিলেই সে 'অ্যানাটমি হল' খুলে দেবে। তাকে বলে রাখব আমি। আমাকে সে খুব খাতির করে। তুমি কিন্তু কোন আলো বা টর্চ নিয়ে যেতে পারবে না। অন্ধকারে হলের ভিতর ঢুকতে হবে। টেবিলটা কোথায় আছে তা আন্দাজ করে নিতে পারবে আশা করি। প্রোসেকটারের ঘরের সামনেই। রাজি তো?

অমল। রাজি।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা জীবনের মেসে থাকা হল না। তার বোনের বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ এল, রাত্রে সেখানে খাবার জন্য। ঠিক হল রাত্রি বারোটার পর কানুই অমলের সঙ্গে যাবে। কানু দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে আর অমল ঢুকবে 'অ্যানাটমি হলে।'

ঘড়িতে 'এলার্ম' দিয়ে শুয়েছিল তারা বারোটার সময়। এলার্ম বাজতেই উঠে পড়ল দুজনে। অমল সিঁদুর আর তেল আগেই গুলে রেখেছিল একটা শিশিতে। সেইটে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দুজনে।

কানু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। অমল চলে গেল অ্যানাটমি হলের দিকে। গিয়ে দেখল 'অ্যানাটমি হলে' ঢোকবার কপাটটা খোলা রয়েছে। জীবেন আগেই সে ব্যবস্থা করে রেখেছিল। প্রথমে ঢুকেই কিছু দেখতে পেল না সে। সব অন্ধকার।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। খুট খুট করে শব্দ হল। ভাবলে ইঁদুর সম্ভবতঃ। অন্ধকারে চোখটা অভ্যস্ত হওয়ার পর টেবিলগুলো আবছাভাবে চোখে পড়তে লাগল। প্রোসেকটারের ঘরের সামনের টেবিলটাও চোখে পড়ল তার। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। টেবিলটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর ডান হাতের তর্জনী আঙ্গুলটায় সিঁদুর মাখিয়ে মড়ার কপালে যেই সেটা লাগাতে যাবে অমনি অপ্রত্যাশিত কান্ড হয়ে গেল একটা। মড়াটা তাকে জাপটে ধরল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর একটা চিৎকারও শোনা গেল ভিন্ন কণ্ঠে।

ছুটে গেল কানু আর মুন্না ডোম।

গিয়ে দেখল, অমল অজ্ঞান হয়ে আছে আর জীবেন রক্তে ভাসছে। মড়াটাকে টেবিল থেকে নামিয়ে দিয়ে জীবেনই শুয়েছিল টেবিলের উপর। মুন্নার সঙ্গে সড় করে। আর অমলও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল একটা ছুরি। মুখে জলের ঝাপটা দিতেই অমলের জ্ঞান ফিরে এল। জীবেনকে 'ইমারজেন্সি রুমে' নিয়ে যাওয়া হল। কানু তার কাছে রইল।

অমল যখন নিজের ঘরে ফিরল তখন দুটো বেজে গেছে। ঘরে ঢুকেই আবার চীৎকার করে উঠল অমল।

সেই কালো ষন্ডা মড়াটা তার বিছানার উপর বসে আছে। প্রকান্ড চোখ, মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি, দাঁতগুলো বেড়িয়ে আছে। ভূত!

ভূত ধীরভাবে বলল—''তোমাদের খেলা তো শেষ হল, এইবার আমার একটা ব্যবস্থা কর। আমাকে নীচে মেঝের উপর শুইয়ে রেখেছে। আমার বড় শীত করছে।—''

অমল কিন্তু তার কথাগুলো শুনতে পেল না, কারণ সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।''[৯]

বিষয়বস্তু চয়নের ক্ষেত্রে এই তিনজন গল্পকারের অনেক সাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্যও আছে প্রচুর। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের বিষয়বস্তু সমাজ সমস্যার গভীরে প্রোথিত। যেমন 'ঢাক মহাশয়' অথবা 'মুক্তামালা' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত গল্পের বিষয়বস্তু যেভাবে সমাজ সমস্যার গভীরে আমাদের নিয়ে যায় পরশুরামের গল্প অথবা বনফুলের গল্প সেভাবে আমাদের সমাজ সমস্যার গভীরে নিক্ষেপ করে না। পরশুরাম নিজেই বলেছেন: ''হালকা বিষয় নিয়ে কিছু কিছু লিখেছি।'' অর্থাৎ সবসময় গুরুগম্ভীর বিষয় নয় অনেক ক্ষেত্রেই হাল্কা বিষয় নিয়েও পরশুরাম বহু গল্প সৃষ্টি

করেছেন। মানব সমাজের যে সমস্ত বিষয়কে তিনি ব্যঙ্গের উপযুক্ত মনে করেছেন তাই গল্পের বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। দীর্ঘ আটত্রিশ বছরে পরশুরাম ৯৯টি গল্প লিখেছেন। এই সময়ের মধ্যে দেশ কালের ব্যাপক পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করেছি। পরশুরামের সংবেদনশীল মনে এই বিষয়গুলির নানা প্রতিক্রিয়া হয়েছে। তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বিচিত্র বিষয় তাঁর গল্পে হাজির হয়েছে। অন্যদিকে বনফুল নব নব বিষয়কে অবলম্বন করে বাংলা ছোটগল্পে রসবৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর গল্পের সংখ্যাও অনেক, প্রায় ৬০০ টি। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে বনফুল বাংলা কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে অদ্বিতীয়। ছোটগল্প ও তার বিষয় নিয়ে বনফুল তাঁর নিজস্ব ধারণা একটি কবিতায় লিপিবদ্ধ করেছেন :

‘‘নদীর বুকে আলোর ঝলক,
গালের উপর চূর্ণ অলক,
মুচকি হাসি, ত্রস্ত পলক,
হলদে পাখীর ‘টিউ’।
বর্ষা-ঘন রাত্রি নিবিড়,
‘দেশ’ রাগিণীর সুমিষ্ট মীড়,
গঙ্গা ফড়িং, বিহঙ্গ নীড়
টিকিট কেনার ‘কিউ’।
জোনাকীদের নেবায় জ্বলায়
রূপসীদের ছলায় কলায়
প্রতিদিনের থামায় চলায়
ছোট গল্প আছে।
পাহাড় কভু, কখনও মেঘ,
কখনও থির, কখনও বেগ,
কান্না কভু, কভু আবেগ
বিদ্যুতেরই নাচে
এই আছে এই নেই,
ধরতে গেলে বদলে যে যায়
একটি মুহূর্তেই!
ছোটগল্প বহুরূপী
শিল্পী-স্বয়ম্বরা

তাদের কাছেই মাঝে মাঝে
দিয়ে ফেলেন ধরা—
গৃহস্থ হন বন্য
আমরা তখন মহানন্দে
করি ধন্য ধন্য।''[১০]

বনফুল গবেষক ড. নিশীথ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য :

> ''বিষয় বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে তাঁর শিল্পপ্রতিভার দক্ষতা দেখে আমাদের মুগ্ধ হতে হয়। বাংলা কথাসাহিত্যের খুব কম বিষয়ই আছে যেখানে বনফুলের হাত পড়েনি। সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, নৃতত্ত্ব, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, কাব্য দর্শন প্রায় সবকিছুকেই স্পর্শ করেছে তাঁর প্রতিভা। তাঁর শিল্পী মন ঘুরে বেড়িয়েছে দেশ বিদেশের সাহিত্য চর্চার অঙ্গনে। বিষয়বস্তুর অভাবে তাঁকে কখনো ভূগতে হয়নি।''[১১]

এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসুর উক্তিটি স্মরণীয়। তিনি বলেছেন :

> ''অধিকাংশ গল্পলেখকদের নিজের নিজের এলাকা বা গন্ডী আছে যা থেকে তারা উপাদান সংগ্রহ করেন। যে পরিবেশ ও সমাজের সঙ্গে তাদের পরিচয় আছে, যে-সব বিষয়ে তারা ভাল রকম জানেন এবং যে পদ্ধতি বা রচনা ভঙ্গিতে তাঁদের হাত খোলে, সেই পরিবেশ, সমাজ, বিষয় আর পদ্ধতিই তাঁদের উপজীব্য। বাঁধাধরা পরিধির মধ্যে একই রকম বিষয় নিয়ে বহু গল্প লিখে যশস্বী হয়েছেন এমন লেখক এ দেশে ও বিদেশে অনেকে আছেন। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় অবলম্বন করে সমান কৃতকার্য হয়েছেন—এমন লেখক সকল দেশেই বিরল।''[১২]

বনফুল এ ক্ষেত্রে সত্যিই ব্যতিক্রম।

গল্প বিষয়ের অন্তর্নিহিত বক্তব্যের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরামের মধ্যে এ বিষয়ে সাদৃশ্য যত প্রকট বনফুলের সঙ্গে ততটা নয়। হাতুড়ে চিকিৎসকদের ব্যঙ্গ করে ত্রৈলোক্যনাথ ও বনফুল গল্প লিখলেও বনফুল কিন্তু সেভাবে হাতুড়েদের ব্যঙ্গ করে গল্প লেখেননি। অথচ তিনি নিজে ছিলেন চিকিৎসক। সেই সুবাদে চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা অসঙ্গতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় সব থেকে বেশী। হাতুড়ে চিকিৎসকদের ভন্ডামি সেভাবে তাঁর গল্পে আমরা পাই না। ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরাম যেখানে হাতুড়ে চিকিৎসকদের ভন্ডামিকে তাদের গল্পে বিদ্রূপ করেছেন সেখানে বনফুল

আধুনিক চিকিৎসা ব্যাবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ভারতবাসীর প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর 'হনুমান সিং' গল্পটির কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। পুত্রের হুক ওয়ার্ম হয়েছে শুনে হুক ওয়ার্ম শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি না করতে পেরে হনুমান সিং স্বাভাবিক ভাবেই গর্জন করে ওঠেন :

> ''হুক্কা পি কর বেমারি বানায়ে হে, শালা। মানা করতে করতে হায়রান হো গিয়া। কেত্না দফে তুমকো কহা থা—আরে শালা, হুক্কা মৎ পিও। ডাক্টার সাহেব যন্তর দেকে পকড় লিহিন হুক্কা বেমারি হুয়া হ্যায়, তব্ ভি চালাকি? উল্লু কাঁহিকা—''[১৩]

বনফুল জানতেন আমাদের দেশে হাতুড়ে চিকিৎসকদের রমরমার জন্য তারা নিজেরা যতটা দায়ী তার থেকে অনেক বেশী দায়ী এ দেশের অশিক্ষিত মানুষেরা। এই অশিক্ষিত মানুষদের সহজ বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে হাতুড়েরা তাদের রমরমা চালিয়ে যান। হাতুড়েদের চিকিৎসা নিয়ে এদের বিশ্বাস এতটাই যে প্রকৃত চিকিৎসা ব্যাবস্থাটিও এদের কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হয়। অর্থাৎ ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরাম যেখানে ভন্ড চিকিৎসকদের কেরামতির কথা বলেছেন সেখানে বনফুল রোগীদের আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থার কথা তুলে ধরেছেন। বনফুল এভাবেই তাঁর দৃষ্টিকে সমাজ সমস্যার গভীরে প্রসারিত করতে চেয়েছেন।

(৪)

গল্পকথনের ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যনাথ বাংলা সাহিত্যে এক ভিন্ন ধারার প্রবর্তক। বাংলাদেশে বাঙ্গালীর গল্প বলার বৈঠকী মেজাজের ধারাকে ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর ছোটগল্পে রূপদান করেছেন। বাংলা দেশের দাদু ঠাকুমারা যেমন নিজের মত করে রামায়ন মহাভারতের কাহিনিগুলিকে নাতি নাতনীদের কাছে বলে তাদের মনে এক কল্পনার জগৎ তৈরী করেন, তেমনই এই বৈঠকী গল্পের কথকেরাও এক সম্ভব-অসম্ভবের জগতে বিচরণ করে। ত্রৈলোক্যনাথ বাংলা গল্পে এই বৈঠকী গল্পের ধারা প্রবর্তন করেন। অর্থাৎ বলা চলে যে মৌখিক গল্পধারা এতদিন নানাভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল ত্রৈলোক্যনাথ সেই গল্পধারাকে লিখিত সাহিত্যে এনেছেন। বাংলা সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথের এটি সবচেয়ে বড় দান। বৈঠকী গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য একজন বক্তা অর্থাৎ যিনি গল্প বলেন আর একাধিক শ্রোতা অর্থাৎ যারা গল্প শোনেন। একে মৌখিক গল্পধারাও বলা যায়। এখানে অনেক সময়েই গল্পের মধ্যে জন্ম নেয় একাধিক গল্প অথবা একটি গল্পসূত্রে গল্পকথক একাধিক ছোটগল্পের অবতারণা করেন এবং শ্রোতারা তা মনোযোগ সহকারে শোনেন

অথবা গল্প কথককে বিভিন্নভাবে গল্পকথনে উৎসাহিত করে চলেন। এই গল্পগুলির বাস্তব সত্যতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে না—বেশির ভাগ ঘটনাই আজগুবি ও অতিরঞ্জিত। আজগুবি ও অতিরঞ্জন এই সমস্ত গল্পের প্রাণ। বৈঠকী গল্পের এই রীতিতে ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর গল্পের আসর জমিয়ে তুলেছেন। এ কারণেই শিশিরকুমার দাশ লিখেছেন :

''ত্রৈলোক্যনাথকে গল্প লেখক অপেক্ষা তাই গল্প কথক বলা চলে। তাঁর গল্পগুলি পড়লে স্পষ্টবোঝা যায় তিনি এক অদৃশ্য বৈঠক কল্পনা করেছেন এবং তাদেরই উদ্দেশ্যে তিনি গল্প বলে চলেছেন। কথোপকথনের ভঙ্গিটি কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয়নি।''[১৪]

সাহিত্য সমালোচক ভূদেব চৌধুরীও ত্রৈলোক্যনাথ সম্পর্কে প্রায় একই কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন :

> ''বস্তুত গল্প লিখলেও আসলে শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথ ছিলেন গল্পের কথক; লেখনীর মুখ দিয়ে তিনি গল্প বলেছেন। আর যে কোন আদর্শ গল্প বলিয়ের মতোই কাহিনীর সঙ্গে নিজের অজ্ঞাতেই তিনি সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে পড়েছিলেন। তখন মূল কাহিনীর আড়ালে-আবডালে বক্তার বিশ্বাস এবং অনুভুতি স্মিত হাস্যের মত এখানে-ওখানে অনায়াসে ছড়িয়ে পড়েছে।[১৫]

প্রমথনাথ বিশী বলেছেন :

> ''ত্রৈলোক্যনাথ গল্প বলিবার সহজাত শক্তি লইয়া জন্মিয়াছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে এই শক্তি অতিশয় বিরল। গল্প অনেকেই লেখেন, কিন্তু গল্প বলিবার ভঙ্গি সাহিত্য হইতে প্রায় লোপ পাইবার মুখে। সাহিত্য লিখিত আকার ধারণ করিবার পূর্বে গল্প বলিবার ভঙ্গি মানবসমাজে প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহা লুপ্তপ্রায়। এখন আমরা গল্প পড়ি, গল্প শুনি না। ত্রৈলোক্যনাথের প্রতিভার মধ্যে গল্প বলিবার আদিমশক্তি বিদ্যমান। সে গল্পও আবার বাংলায় যাহাকে আষাঢ়ে গল্প বলে। এ শক্তি বাংলা সাহিত্যে অতি বিরল বলিলেও চলে।''

ত্রৈলোক্যনাথের গল্পগুলির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে তিনি তার প্রায় বেশীরভাগ গল্পেই এই বৈঠকী রীতি বা মৌখিক গল্পধারাকে অনুসরণ করেছেন। তাঁর সমস্ত গল্পই বৈঠকী গল্প, 'মুক্তামালা'ও তাই। প্রতিটি গল্পেই রয়েছে আসর জমানো ভাব। 'মুক্তামালা' গল্পগ্রন্থের প্রথমেই রয়েছে এই আসরের পরিচয় :

> ''প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা মহাদেববাবু মজলিস করিয়া বসেন। সেই মজলিসে যাদব, মাধব, রাঘব, ত্রিলোচন, গদাধর, ঘনশ্যাম প্রভৃতি বন্ধুগন নিয়মিতরূপে উপস্থিত থাকেন। সেই মজলিসে সকলে গাজার ধুম পান করেন। মহাদেব বাবুর টাকায়

সভার সমুদয় ব্যায় নির্ব্বাহিত হয়। সুতরাং মহাদেব বাবু আর আড্ডাধারী, দলের দলপতি। সভায় সভ্যগন সর্ব্বদাই তাঁহার প্রিয়পাত্র হইতে চেষ্টা করেন। ভাল রূপে আজগুবী গল্প করিতে পারিলেই মহাদেব বাবুর সন্তোষভাজন হইতে পারা যায়। গাঁজার ধূম পান করিতে করিতে সভায় প্রতিদিন নানা রূপ গল্প হয়।''[১৬]

গল্পের শুরুতে প্রথম পুরুষে বৈঠকের চিত্র এবং বৈঠকের চরিত্রদের পরিচয় দিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ গল্প শুরু করেছেন। গল্প বলার দায়িত্ব নেন ঘনশ্যামবাবু। কিন্তু ঘনশ্যামবাবু নিজে উত্তম পুরুষে গল্প না বলে গল্প বলেন সুবল গড়গড়ি চরিত্রের মাধ্যমে। অর্থাৎ প্রকৃত কথক হিসেবে আমরা সুবল গড়গড়িকেই পাই। সে-ই উত্তম পুরুষে একটার পর একটা গল্প করেছে। গল্প করতে করতে গল্পের মধ্যেও আবার গল্প সৃষ্টি করেছে। কখনো এই নতুন সৃষ্ট গল্পের জন্য তৈরী হয়েছে আলাদা গল্পের আসর। 'মূল্যবান তামাক ও জ্ঞানবান সর্প' গল্পে এই আলাদা আসরের পরিচয় রয়েছে :

''ফরাস ডাঙ্গায় পূর্ব্বে অনেক গুলির আড্ডা ছিল তাহার সঙ্গে দুই-একটি গাঁজার আড্ডাও ছিল। তাহাদিগের মধ্যে জয়গোবিন্দ ভড়ের আড্ডাটি সর্ব্বপ্রধান ছিল। সেই আড্ডায় মাণিকবাবু, নবীনবাবু, হরেনবাবু, গণেশবাবু প্রভৃতি অনেক বাবু সভ্য ছিলেন। ভড় মহাশয় ইহার আড্ডাধারি ছিলেন।''[১৭]

এখানে কিন্তু সুবল গড়গড়ি আর গল্পের উত্তম পুরুষ কথক নন। এখানে গল্পের উত্তম পুরুষ কথক তিনুবাবু। তবে তিনুবাবুর গল্প বলা যেই শেষ হয়েছে তেমনি আবার কথকের ভূমিকায় হাজির হয়েছে সুবল গড়গড়ি। এখানে গল্প কথকের শৃঙ্খলটি লক্ষ্যনীয়। প্রথমে লেখক, তারপর ঘনশ্যামবাবু, সুবল গড়গড়ি এবং শেষে তিনুবাবু। এরপর আবার বিপরীতক্রম বিন্যাসে গল্প কথনের দায়িত্ব লেখকের নিজের কাছে ফিরে এসেছে। গল্প কথনের এই কৌশলটির দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

লেখক>ঘনশ্যাম বাবু>সুবল গড়গড়ি>তিনু বাবু

তিনু বাবু<সুবল গড়গড়ি<ঘনশ্যাম বাবু<লেখক

'মুক্তা মালা' গল্পগ্রন্থের শেষভাগে সুবল গড়গড়ি যখন তার গল্প বলা শেষ করে তখন :

''মহাদেববাবুকে সম্বোধন করিয়া ঘনশ্যাম বলিলেন,—''আড্ডাধারী মহাশয়! সুবল গড়গড়ি মহাশয়ের কাহিনী আপনারা শ্রবণ করিলেন। আজ সেই গল্প শেষ হইল। এক্ষণে আপনারা ইহার ভালো মন্দ বিচার করুন।''

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন যে, বেতাল পঁচিশ, বত্রিশ সিংহাসন ও আরব্য উপন্যাসের পর এরূপ অদ্ভূত ঘটনা পৃথিবীতে আর কখনো ঘটে নাই।

তাহার পর সভ্যদিগের মধ্যে বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। সনাতন নস্কর, ভূমিকম্প মহাশয়, গির্জ্জা, সমুদ্র, ঝিনুক, সুন্দর বনের ব্যাঘ্র, ডাকিনী, কালীর মন্দির, এই সকল বিষয় সম্বন্ধে গড়গড়ি মহাশয় যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা সত্য, অথবা পাগলের ভ্রান্তি, এই কথা লইয়া ঘোর বাদানুবাদ উপস্থিত হইল।

হলধর বলিলেন—''এ সমূদয় ঘটনা প্রকৃত ঘটে নাই। হয় পাগল অবস্থায় আর না হয় বিকার অবস্থায় গড়গড়ি মহাশয়ের মস্তিষ্কে এই সমূদয় অলীক দৃশ্য আবির্ভূত হইয়াছিল।''

ঘনশ্যাম বলিল—''এ সমূদয় ঘটনা সত্য ঘটিয়াছিল। এমন অদ্ভূত ঘটনা কখন মিথ্যা হইতে পারে না।''

হলধর উত্তর করিলেন,—''গড়গড়ি মহাশয় যদি শ্বশুরালয়ে শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন, তাহা হইলে কি করিয়া তিনি কলিকাতা গমন করিলেন?''

দুই পক্ষের বাদানুবাদ শ্রবণ করিয়া অবশেষে মহাদেববাবু ধীর গম্ভীর স্বরে আপনার রায় প্রকাশ করিলেন।''

মহাদেববাবু বলিলেন,—''গড়গড়ি মহাশয় যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, তাঁহার জড়দেহ শ্বশুরালয়ে পড়িয়াছিল। নাক্ষত্রিক দেহ অবলম্বন করিয়া তিনি কলিকাতায় গমন করিয়াছিলেন।''

হলধর বলিলেন,—সে কথা সম্ভব। তা হইতে পারে। সেই যারে বলে তাড়িত-দেহ। সেই তাড়িত-দেহে গড়গড়ি মহাশয় এই সকল কান্ড করিয়াছিলেন।''

অদ্ভুৎ ঘটনা সমূহ সম্বন্ধে আড্ডাধারী মহাশয় এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন। তাহাতে সকলের মন হইতে সন্দেহ দূর হইল। প্রফুল্ল মনে সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।''[১৮]

ত্রৈলোক্যনাথ যে কথকতার ধারাকে বাংলা ছোটগল্পে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন পরবর্তীকালে সেই ধারাকেই পুষ্ট করেছিলেন রাজশেখর বসু। এ ক্ষেত্রে রাজশেখর বসু ছিলেন ত্রৈলোক্যনাথের সার্থক উত্তরাধিকারী। প্রমথ চৌধুরী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের ছোটগল্পে এই কথকতার ধারা লক্ষ করা গেলেও রাজশেখরের মতো এদের কারো রচনাতেই এই ধারার সার্থক প্রয়োগ দেখা যায় না। তাই সমালোচক যথার্থই বলেন :

''ত্রৈলোক্যনাথ বাংলা সাহিত্যে যেমন ঐতিহ্য বহির্ভূত নন—তেমনই তিনি একক নন—বর্তমান বাংলা সাহিত্যেও তাঁর শিষ্য রয়েছেন। 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী'র শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথের উত্তরসাধক।''[১৯]

যে সমস্ত গল্পে রাজশেখর বসু বৈঠকী মেজাজ এনেছেন সে সমস্ত গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'চিকিৎসা সঙ্কট', 'দক্ষিণ রায়', 'স্বয়ম্বরা', 'মহেশের মহাযাত্রা', 'লম্বকর্ণ', 'গুরু বিদায়', 'রাতারাতি', 'জটাধর বক্শী, 'তিলোত্তমা', 'নিকষিতহেম', 'দ্বান্দ্বিক কবিতা', 'দাঁড়কাগ', 'যদুডাক্তারের পেশেন্ট', 'একগুয়ে বার্থা', 'চাঙ্গায়নী সুধা', 'কামরূপিনী', 'ধনুমামার হাসি', 'গুপী সাহেব', 'প্রেমচক্র, 'বিরিঞ্চিবাবা, 'রামরাজ্য', 'তিন বিধাতা', 'দীনেশের ভাগ্য', 'শোনা কথা' প্রভৃতি। এই গল্পগুলির মধ্যে যে বৈঠকখানাগুলির পরিচয় পাওয়া যায় তাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানা। এই বৈঠকের অন্যান্য সদস্যরা হলেন বিনোদ উকিল, শ্যালক নগেন, ভাগনে উদয় ও আড্ডার প্রধান আকর্ষণ বৃদ্ধ কেদার চাটুজ্যে। এছাড়া রাজশেখর বসুর গল্পে আরো যে বৈঠকখানাগুলির পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলি হল নতুনদিল্লীর গোল মার্কেটের পিছনে কালীবাবুর ক্যালকাটা টি কেবিন, উকিল বিনোদবাবুর বাড়িতে সান্ধ্য আড্ডা এবং যতিষ মিত্রের আড্ডার আসর। ত্রৈলোকনাথের মহাদেববাবুর বৈঠকখানা অথবা ডমরুধরের আড্ডার আসর যেমন একের পর এক গল্পের জন্ম দিয়েছে তেমনি পরশুরামের এই আড্ডার আসরগুলি থেকে বেড়িয়ে এসেছে একটার পর একটা গল্প। যেমন :

বৈঠকখানা	**গল্প**
(১) বংশলোচন বাবুর বৈঠকখানা	'দক্ষিণ রায়', 'স্বয়ম্বরা', 'মহেশের মহাযাত্রা', 'লম্বকর্ণ', 'ক্যালকাটা টি কেবিন','জটাধর বক্সী' 'জটাধরের বিপদ', 'চাঙ্গায়নী সুধা'।
(২) গোপালবাবুর বাড়ির সান্ধ্য আড্ডা	'তিলোত্তমা', 'সিদ্ধিনাথের প্রলাপ'।
(৩) যতীশ মিত্রের আড্ডা	'নিকষিত হেম', 'দ্বান্দ্বিক কবিতা', 'দাঁড়-কাগ'

পরশুরাম কল্পিত এইসব বৈঠকখানাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই ত্রৈলোক্যনাথের সমধর্মী। এদের মধ্যে সাদৃশ্য যেমন আছে তেমনি পার্থক্যও আছে। ত্রৈলোক্যনাথের আড্ডার আসর যেখানে ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ সেখানে পরশুরাম অবলীলায় আড্ডার আসর জমাতে

পারেন ট্রেনের কামড়ায় ('একগুয়ে বার্থা'), অথবা শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনে ('কামরূপিনী') অথবা পার্কে ('শোনা কথা')। দুজনের বৈঠকী স্বভাবের তুলনা করতে গিয়ে উজ্জ্বল গঙ্গোপাধ্যায় যে মন্তব্যটি করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য :

> ''...ত্রৈলোক্যনাথের মতো পরশুরামের আড্ডা নেরশাখোরদের আড্ডা নয়। জটাধর তার মিথ্যা ভাষণে প্রমথ চৌধুরীর নীল লোহিতকে মনে করালেও পরশুরামের আড্ডার শ্রোতারা পেগ্ হাতে গল্প শোনে না, চায়ের গেলাসই তাদের সম্বল, খুব জোর চাঙ্গায়নী সুধা। তবে বৈঠকী গল্পের ধারায় সিদ্ধিনাথ বাবুর খোঁজ আমরা পরশুরামের আগে পাইনি। যেখানে বৈঠকী গল্পের বিষয় ছিল মূলত আজগুবি গল্প বলা, সেখানে অনেক গুরু গম্ভীর বিষয়ের আলোচনার জন্যও পরশুরাম বৈঠকি পরিবেশ ব্যাবহার করলেন। আজগুবিরসের আমদানি পরশুরামের গল্পে যদিও ব্যঙ্গেরই কৌশল, তবু বৈঠকে গুরু গম্ভীর বিষয়ের আলোচনা একটি নতুন মাত্রা যোগ করল।''[২০]

ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরামের গল্পকথনের মূল বৈশিষ্ট্য যদি বৈঠকী রীতির হয় তাহলে বনফুলের গল্পকথনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য প্রমিতকথন। ত্রৈলোক্যনাথের আগ্রহ ছিল সম্প্রসারণের দিকে কিন্তু বনফুলের আগ্রহ ছিল সংকোচনের দিকে। আর পরশুরামের অবস্থান এদের মাঝামাঝি জায়গায়। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পগুলি যতটা দীর্ঘ বনফুলের গল্প ঠিক ততটাই সংক্ষিপ্ত। বনফুলের এমন অনেক গল্প রয়েছে যার দৈর্ঘ এক পাতারও কম। মাত্র ষোল লাইনেও গল্প লিখেছেন বনফুল। যেমন তাঁর একটি গল্প 'যা হয়' :

> ''চার বছরের অভি কারও চাকর নয়। সে অনেক বায়না করে অনেক রকম দুষ্টুমি করে তবে দুধটুকু খেল। তারপর জামা-পায়জামা পরবার সময়ও অনেক খোশামোদ করতে হল তাকে। অনেক ভুলিয়ে ভালিয়ে, অনেকবার আদর করে, অনেকরকম লোভ দেখিয়ে তবে পরানো হল তাকে জামা-পায়জামা। তারপর ঠাকুমা তার চুল আঁচড়ে দিলেন, তাতেও ঘোর আপত্তি। কিছুতেই সে নিজের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হতে দেবে না। যা করবে নিজে করবে। সাজ-গোজ যখন শেষ হয়ে গেল তখন সে নিজের কাঠের ঘোরাটার উপর চড়ে বসে বলতে লাগল, হেট্ হেট্, চল, চল। আপিসের লেট হয়ে যায় যে।
>
> সবাই হাসতে লাগলো।
>
> অভির বাবা চাকুরে। সে সকাল থেকেই তাড়া দিচ্ছে, তাড়াতাড়ি খেতে দাও। তাড়াহুড়ো করে স্নান সেরে নিলে কোনোক্রমে। তারপর গপাগপ করে তপ্ত ভাত

ডাল তরকারি গিলতে লাগলো। কোনও ক্রমে খেয়ে উঠেই কোট প্যান্ট টাই পড়তে লাগলো আয়নার সামনে নানা রকম মুখভঙ্গী করে। আর অভির মাকে অকারণে ধমকাতে লাগলো এটা দাও ওটা দাও বলে। তারপর চীৎকার করে চাকরকে বলল—রাম সিংকে তাড়াতাড়ি মোটরটা স্টার্ট করতে বল। আপিসে লেট হয়ে যাবে আজ দেখছি।

হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল। কেউ হাসলো না।''[২১]

এখান থেকেই দেখা যায় যে কত সংক্ষিপ্ত ভাষণে বনফুল তার নিজের বক্তব্যকে পাঠকের সামনে হাজির করেছেন। বনফুল গল্প লিখতে গিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তবে এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি করেছেন গল্পের উপস্থাপনকে কেন্দ্র করে। অবশ্য পরশুরামেরও কিছু গল্প রয়েছে যেগুলির দৈর্ঘ একপাতা কিম্বা একপাতার একটু বেশী। 'পুনর্মিলন', 'উপেক্ষিত', 'উপেক্ষিতা' ইত্যাদি গল্পগুলি দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। অতি সংক্ষিপ্ত বলেই 'উপেক্ষিতা' গল্পটিকে এখানে তুলে ধরা যেতে পারে।

''তিন নম্বর রোডোডেনড্রন রোড, বালিগঞ্জ। বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। ড্রইংরুমে পিয়ানের কাছে উপবিষ্ট গরিমা গাঙ্গুলী, তাহার সম্মুখে ইজিচেয়ারে চটক রায়। ঘরে আসবাব বেশী নাই, কারণ গরিমার বাবার ঢাকায় বদলির হুকুম আসিয়াছে, অধিকাংশ জিনিস প্যাক হইয়া আগেই রওনা হইয়া গিয়াছে।

এই চটক ছেলেটি যেমন ধনী তেমনই মিষ্টভাষী বিনয়ী বাধ্য, চিমটি কাটিলেও টু শব্দ করে না—যাহাকে বলে নারীর মনুষ্য অর্থাৎ লেডিজম্যান। না হইবে কেন, সে যে পাঁচ বৎসর বিলাতে থাকিয়া সেরেফ এটিকেট অধ্যয়ন করিয়াছে। এমন সুপাত্র আজকালকার বাজারে দুর্লভ। গরিমার পিতামাতা কলিকাতা ত্যাগের পূর্বেই কন্যাকে বাগ্‌দত্তা দেখিতে চান, তাই তাঁহারা যাত্রায় পূর্বসন্ধ্যায় ভাবী দম্পতীকে বিশ্রম্ভালাপের সুযোগ দিয়া দোতলায় বসিয়া সুসংবাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

কিন্তু আলাপ তেমন জমে নাই। গোটা পনের গান শেষ করিয়া গরিমা তৃতীয় বার জানাইল—'কাল আমরা যাচ্ছি।'

চটক বলিল—'ও'

হায় রে, বিদায়বার্তার এই কি উত্তর! গরিমার কথা জোগাইতেছে না। বলিল —'সেই ভুটানী গজলটা গাইব কি?'

'নাঃ, এইবার ওঠা যাক।'

'সেকি হয়, আগে বৃষ্টি থামুক।'

চটক চেয়ারে নীরবে উশখুশ করিতে লাগিল। মিনিট-দুই পরে আবার বলিল—'এইবার উঠি।'

গরিমা ভাবিতেছিল, কবি বৃথাই লিখিয়াছেন—'এমন দিনে তারে বলা যায়।' এই বাদল সন্ধ্যা কি নিস্ফল হইবে? চটকের কি হইল? কেন সে পালাইতে চায়? তাহার কিসের অস্বস্তি, কিসের অস্থিরতা? গরিমার মোহিনী শক্তি আজ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। সে ভেটকিমুখী বেহায়া মেনী মিত্তিরটা চটককে হাত করে নাই তো? হবেও বা, যা গায়ে পড়া মেয়ে! গরিমা তাহার কণ্ঠাগত ক্রন্দন গিলিয়া ফেলিয়া বলিল—আর একটু বসুন।'

কিন্তু চটক বসিল না। চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—নাঃ, চললুম, গুড নাইট।'

বৃষ্টির নিরবচ্ছিন্ন ঝমঝমানি ভেদ করিয়া চটকের মোটর গুঞ্জরিয়া উঠিল। গেল, যাহা বলিবার তাহা না বলিয়াই চলিয়া গেল—ভোঁপ, ভোঁপ—দূরে, বহু দূরে।

গরিমা কাঁদিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া চটকের পরিত্যক্ত চেয়ারে দেহলতা এলাইয়া দিল। তাহার পরেই এক লাফ। ভীষণ সত্য সহসা প্রকট হইল। বেচারা চটক!

চেয়ারে অগনতি ছারপোকা।''[২২]

—এ গল্পটির প্রকাশ কাল ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ। অর্থাৎ বনফুলেরও আগে পরশুরাম এ ধরনের সংক্ষিপ্ত ছোটগল্প লিখে বাংলা ছোটগল্পে এক ভিন্ন ধারার প্রবর্তন করেন। বনফুলকে এ ধরণের অনুগল্পের স্রষ্টা বলা হলেও পরশুরামের নামও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা উচিত।

তবে একথা ঠিক যে বনফুলের গল্প বলার ধরণটাই তার গল্পের একটি বড় বিষয়। বনফুল জানতেন যে একজন শিল্পী কখনো একটি নির্দিষ্ট ফর্মে আবদ্ধ থাকতে পারে না। ঠিক যেমন ''বিধাতার শিল্প ভান্ডারে অনেক রং, প্রতিটি সৃষ্টিতেই তিনি অনেক রঙ, অনেক কায়দা ফলিয়েছেন, তাঁর দুটি সৃষ্টি এক রকম হয়নি।'' [২৩] বনফুলের ছোটগল্পের সমীক্ষণে তাই বারবার দেখা যায় যে তিনি প্রচলিত ধরণ ভেঙ্গে নতুন কলাকৌশলের আমদানি করেছেন। বিষয়কে ব্রাত্য করে দিয়ে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন নতুন নতুন খবর। কখনো দ্রুত সংবাদ পরিবেশনের ভঙ্গীতে কখনো একটু বিস্তারিতভাবে এই খবর

পরিবেশন করেন তিনি। ধরাযাক 'সমাধান' গল্পটির কথা। গল্পের বিষয় বলতে কিছু নেই শুধু রয়েছে কয়েকটি সংবাদ। এই সংবাদগুলি হল :

১. নীহার রঞ্জনের বিবাহ।

২. তার স্ত্রী কন্যা সন্তান প্রসব করলেন।

৩. মেয়েটি কুঁৎসিতই ছিল

৪. তার রূপহীনতাকে নিয়ে অন্য সকলের ঘোর দুঃশ্চিন্তা।

৫. অবশেষে বুঁচির মারা যাওয়ার খবর জানিয়ে চিঠি আসা।

এই কটি সংবাদ পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অযথা দীর্ঘ কাহিনি-কাঠামো নির্মাণ করেননি বনফুল। অথবা বাক্যের সমন্বয়ে ভারাক্রান্ত করেননি গল্পকে। অল্পকথায় মাত্র ছোট বড় ২২টি লাইনে গল্পটি সমাপ্ত করেছেন কোন রকম শৈল্পিক ত্রুটি বিচ্যুতি না ঘটিয়ে। গল্পটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

''আকাশ নীল, বাতাস স্নিগ্ধ, ফুল সুন্দর এবং আমার নাম নীহার রঞ্জন হওয়া সত্ত্বেও আমার বিবাহ হইল পাকড়াগ্রামবাসিনী ক্ষান্তমণি নাম্নী এক পল্লীবালার সহিত এবং বৎসরান্তে তিনি একটি কন্যারত্ন প্রসব করিয়া তাহার নাম রাখিয়া দিলেন—বুঁচি। নামকরণটিতে একটু আপত্তি করিয়াছিলাম। তাহাতে বাড়ির এবং পাড়ার সকলে সত্য কথাই বলিল—''এই কালো কুচ্ছিৎ মেয়ে, তার নাম পুষ্পমঞ্জরী দিবি নাকি? তোর যতসব অনাছিষ্টি—''

মেয়েটা কুৎসিতই ছিল। রঙ তো কালোই, একটা চোখ ছোট আর একটা বড়, তা ছাড়া কি রকম যেন বোকাহাবা ধরণের—মুখে সর্বদাই লালা ঝরে! পুষ্পমঞ্জরী নাম দেওয়া চলে না তা ঠিক।

বছর দুই পরে।

ক্ষান্তমণি বুঁচিকে লইয়া বাপের বাড়ি গিয়াছেন। সেদিন রবিবার, কাহারও কাজকর্ম নাই—চন্ডীমন্ডপে বসিয়া নানা আলোচনা চলিতেছে। হঠাৎ আমার কথাই উঠিয়া পড়িল।

নৃপেন বলিল—''এই দেখ না নীহারের অদেষ্ট। হল বা যদি একটা মেয়ে, তাও আবার এমন কদাকার—''

শ্যাম বোস বললেন—''তা আবার বলতে! বিয়ে দেবার সময় নাকের জলে চোখের জলে হতে হবে আর কি! টাকা চাই প্রচুর।''

হারু খুড়ো তামাকটাতে দুইটা টান দিয়া কহিলেন—''আরে ভাই, আজকাল আবার শুধু টাকা হলেই হয় না, লোকে টাকাও চায়—রূপও চায় যে। চোখ দুটো ছোট বড় হয়েই আরও মুশকিল কিনা, কি যে হবে—''

সকলেরই ঘোরতর দুশ্চিন্তা।

এমন সময় পিওন আসিয়া আমাকে একখানা চিঠি দিয়া গেল।

নৃপেন বলিল—''কার চিঠি হে?''

আমি চিঠিটা পড়া শেষ করিয়া বলিলাম—''বউ লিখেছে—বুঁচি মারা গেছে কাল।''[২৪]

—কত সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যঞ্জনাধর্মী। গল্প বলার এ ধরণের টেকনিক বনফুলই আমাদের বাংলা সাহিত্যে প্রথম নিয়ে এসেছেন।

বনফুলের গল্পকথনের আরেকটি বিশেষত্ব হল আত্মকথনের ভঙ্গীতে গল্প বলা। কোন কোন গল্পে লেখক একটি চরিত্রের ভূমিকায় নিজেকে বসিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ গল্পটি আত্মকথার ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। যেমন 'আত্মপর' গল্পের শুরু :

''সারা সকালটা খেটেখুটে দুপুরবেলায় দক্ষিণ দিকের বারান্দায় একটা বিছানা পেতে একটু শুয়েছি। তন্দ্রাটি যেই এসেছে, অমনি মুখের উপর থপ্ করে কি একটা পড়ল। তাড়াতাড়ি উঠে দেখি, একটা কদাকার কুৎসিত পাখির ছানা। লোম নেই, ডানা নেই, কিম্ভূতকিমাকার! রাগে ও ঘৃণায় সেটাকে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। কাছেই একটা বেড়াল যেন অপেক্ষা করছিল—টপ্ করে মুখে করে নিয়ে গেল। শালিখ পাখিদের আর্তরব শোনা যেতে লাগল।

আমি এপাশ-ওপাশ করে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।''[২৫]

অথবা 'এক ফোঁটা গল্প' গল্পে :

'' রামগঞ্জের জমিদার শ্যামবাবু যে খেয়ালী লোক তা জানতাম। কিন্তু তাঁর খেয়াল যে এতদূর খাপছাড়া হতে পারে ভাবিনি। সেদিন সকালে উঠেই এক নিমন্ত্রণপত্র পেলাম। শ্যামবাবু তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে সবান্ধবে নিমন্ত্রণ করেছেন। চিঠি পেয়ে আমার মনে কেমন যেন একটু খটকা লাগল। ভাবলাম, শ্যামবাবুর মায়ের অসুখ হল অথচ আমি একটা খবর পেলাম না! আমি হলাম এদিককার একমাত্র ডাক্তার।''[২৬]

বনফুলের গল্পে এরকম উদাহরণ প্রচুর। তাঁর প্রায় সমস্ত গল্পেই এরকম আত্মকথনের ভঙ্গিতে গল্প বলার ঢংটি লক্ষ করা যায়।

এভাবে দেখা যায় গল্পকথনের ক্ষেত্রে বনফুল ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরামের থেকে অনেকটাই সরে এসেছেন।

(৫)

ছোটগল্পের চরিত্র নিয়ে ছোটগল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

> ''ছোটগল্পে চরিত্র বিকাশের স্থান নাই। বর্ণিত চরিত্র বিকশিতভাবেই পাঠকের সম্মুখে হাজির করা হয়। এবং ঘটনাটির সঙ্গে সে চরিত্রের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দিতে পারিলেই লেখকের কার্য সম্পন্ন হইল। সুতরাং সে ঘটনাটি এমন হওয়া চাই, যাহাতে পর্দায় পর্দায় চরিত্রটির সঙ্গে মিলিয়া যায় অথচ তাহার কোন অংশ নিরর্থক পড়িয়া না থাকে।...যদি ছোটগল্পে এমন কোন ঘটনা ঘটে, যাহা বর্ণিত চরিত্রের সঙ্গে বেশ মিলিয়া যাইতেছে না অথবা সে চরিত্র বুঝিবার পক্ষে সে ঘটনাটি অত্যাবশ্যক নয়, তাহা হইলে সে ছোটগল্প ভালো হইল না। ঘটনায় ও চরিত্রে যদি জমাট না বাঁধিল, তাহা হইলে দু-ই বিফল।''[২৭]

—ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের এই সামঞ্জস্য বিধান ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে আমরা লক্ষ করি। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের চরিত্রগুলিকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি—মানুষ ও মনুষ্যেতর চরিত্র। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ত্রৈলোক্যনাথই প্রথম বাংলা ছোটগল্পে মনুষ্যেতর প্রাণীকে চরিত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে এই মনুষ্যেতর প্রাণীরা মানুষ ছাড়া অন্য কারো কথা বলে। মানব চরিত্রের নানা অসঙ্গতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই লেখক এই মনুষ্যেতর চরিত্র কল্পনা করেছেন। সমালোচক প্রমথনাথ বিশী মহাশয় এর কারণ সম্পর্কে বলেছেন :

> ''মানুষের অসঙ্গতি দেখাইতে হইলে তাহার সহিত তুল্য আবশ্যক। ভূত প্রেতের সমাজের সহিত মানব সমাজের তুলনা অতিশয় সহজ ও বহু প্রচলিত। কাজেই তাঁহাকে (ত্রৈলোক্যনাথকে) বাধ্য হইয়া ভূত প্রেতের সমাজের সাহায্য লইতে হইয়াছে। মানুষকে ব্যঙ্গ করাই তাহার উদ্দেশ্য। ভৌতিক গল্প বলা নয়।''[২৮]

যেমন 'লুল্লু' গল্পে বিভিন্ন ভৌতিক প্রসঙ্গে মানুষের অসঙ্গতিকে সকৌতুকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। গোঁ গোঁ ভূতকে সংবাদপত্রের সম্পাদক করে তৎকালীন সাংবাদিকতার মিথ্যাচারকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে এখানে :

> ''এতদিনে লোকে মানুষ ধরিয়া সম্পাদক করিতেছিল, কিন্তু মানুষে যা-কিছু গালি জানে, মায় অশ্লীল ভাষা পর্যন্ত সব খরচ হইয়া গিয়াছে। এখন দেশসুদ্ধ লোককে ভূতের গালি দিব।''

আমীর গোঁ গোঁ ভূতকে সংবাদ পত্রের সম্পাদক করতে চাইলে গোঁ গোঁ বলে : ''আমি যে লেখা পড়া জানি না।''

আমীর বলে—''পাগল আর কি! লেখা-পড়া জানার আবশ্যক কি? গালি দিতে জানিস তো?''[২৯]

অর্থাৎ এ সমস্ত চরিত্রগুলি বহিরঙ্গে ভূত হলেও অন্তরঙ্গে তারা মানুষ। মানুষের কথাকেই এখানে ভৌতিক চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

অন্যদিকে পরশুরামের গল্পে চরিত্রের ছড়াছড়ি। বহু বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে তাঁর গল্পে। রবীন্দ্রনাথ পরশুরামের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'গড্ডলিকা' পড়ে মন্তব্য করেছিলেন :

> ''বইখানি চরিত্র চিত্রশালা। মূর্ত্তিকারের ঘরে ঢুকিলে পাথর ভাঙ্গার আওয়াজ শুনিয়া যদি মনে করি ভাঙ্গা চোরাই তাঁর কাজ তবে সে ধারণাটা ছেলে মানুষের মত হয়,—ঠিকভাবে দেখিলে বুঝা যায় গড়িয়া তোলাই তাহার ব্যবসা। মানুষের সুবুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধিকে লেখক তাঁহার রচনায় আঘাত করিয়াছেন কিনা সেটা তো তেমন করিয়া আমার নজরে পড়ে নাই। আমি দেখিলাম তিনি মূর্ত্তির পর মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে, মনে হইল ইহাদিগকে চিরকাল জানি''[৩০]

শুধু 'গড্ডলিকা' নয় পরশুরামের সমস্ত গল্পগ্রন্থ সম্পর্কেই একথা সত্যি। কেননা পরশুরাম তাঁর ৯৯টি গল্পে প্রায় সাড়ে সাতশো চরিত্র তৈরী করেছেন। এত বিপুল সংখ্যক চরিত্র বাংলা সাহিত্যে আর কোন শিল্পী নির্মাণ করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ আছে। শুধু সংখ্যার দিক থেকে নয় চরিত্রের বৈচিত্র্যের দিকেও পরশুরামের স্থান বাংলা সাহিত্যে অনন্য। তাঁর চরিত্রগুলিকে মোটামুটিভাবে তিনটি ভাগে বিন্যস্ত করা যেতে পারে—লৌকিক, পৌরাণিক ও মনুষ্যতর চরিত্র। লৌকিক শ্রেণীর চরিত্রের মধ্যে আছে নারী, পুরুষ ও শিশু চরিত্র। ব্যাবসাদার, সাধু-সন্ন্যাসী, ডাক্তার, কবিরাজ, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, যুবক, প্রেমিক-প্রেমিকা, চাকুরিজীবী প্রভৃতি নানাজাতের চরিত্র নিয়ে পরশুরাম কারবার করেছেন। পৌরাণিক চরিত্রের মধ্যে আছে দেব-দেবী,

রাক্ষসী, ঋষি, অপ্সরা প্রভৃতি চরিত্র। আর মনুষ্যেতর চরিত্র হিসেবে পরশুরামের গল্পে ভূত-প্রেত-ডাকিনী-পেত্নী-শাকচুন্নী যেমন আছে তেমনি রয়েছে কুকুর, ছাগল, জেব্রা ইত্যাদি ইতর প্রাণীর চরিত্রও। এই সমস্ত বিচিত্র শ্রেণীর চরিত্র নিয়ে গড়ে উঠেছে পরশুরামের চরিত্র চিত্রশালা। এ ক্ষেত্রে কিন্তু পরশুরাম ত্রৈলোক্যনাথকেও অতিক্রম করে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য থেকে পরশুরামের চরিত্র চিত্রণের আরেকটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, সেটি হল পরশুরাম যে চরিত্রগুলি এঁকেছেন ''তারা সব আমাদের চেনা লোক।'' এ প্রসঙ্গে গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর মন্তব্যটিও উল্লেখযোগ্য :

> ''তাদের দেখে মনে হয় না যে, তারা কোন লেখকের কল্পিত চরিত্র। মনে হয় তারা যেন বইয়ের পাতা থেকে রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে আমাদের একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলছে : অহম্ অহম্ ভো। কত বিচিত্র ধরণের নরনারীকে কত বিচিত্র রেখায় রঙে তিনি জীবন্ত করে তুলেছেন। নিতান্ত রেখা সর্বস্ব স্কেচ তারা নয়, অল্প কয়েকটি তুলির আঁচড়ে তারা সজীব এক একটি 'চরিত্র চিত্র'। ব্রম্মচারি, গন্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া, তারিণি কবিরাজ, নাদু মল্লিক, বিরিঞ্চিবাবা, লটবর নন্দী, জিগীষা দেবী, আফিংখোর কেরাণী, বরদা খুরো পর্যন্ত সবাই আশ্চর্য রকমের সজীব। মনে হয়, এদের সবাইকেই প্রতিদিনের পথে ঘাটে আড্ডায়—বৈঠকে আমরা কোন না কোন সময় দেখেছি।''[৩১]

অর্থাৎ প্রমথচৌধুরী একদিকে যেমন পরশুরামের অঙ্কিত চরিত্রগুলিকে বাস্তব চরিত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন আবার এর পাশাপাশি এই চরিত্রগুলি পরশুরাম কি কৌশলে সৃষ্টি করেছেন তারও একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে পরশুরাম বেশীরভাগ গল্পে যে চরিত্রগুলি অঙ্কণ করেছেন তারা হাস্যরসের উপযোগী চরিত্র হয়ে উঠেছে ঠিকই কিন্তু কোন একটি বিশেষ চরিত্রকে ব্যঙ্গ করাই কিন্তু পরশুরামের উদ্দেশ্য ছিল না।

পরশুরামের হাসি বুদ্ধিপ্রধান। তাঁর অঙ্কিত চরিত্র যতই কপট হোক না কেন সেই কপটতাকে তারা জয় করেছে বুদ্ধি দিয়ে। তারা এমন অকাট্য যুক্তির অবতারণা করেছে যে সম্পূর্ণ মিথ্যা জেনেও তাকে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয় না। 'জটাধর বক্সী' গল্পে জটাধর শ্রোতাদের ভূত দেখানোর নাম করে একটি চমকপ্রদ কাহিনির অবতারণা করেছে :

> ''টি ক্যাবিনে যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে বীরেশ্বর সিংগি একটু বেশী ভীতু। ইনি শিউরে উঠে বললেন, এই সময় চীনা পল্টন এসে পড়ল বুঝি? জটাধর বললেন, কোথায় পল্টন! চারজন জাপানী এগিয়ে এল, দুজনের হাতে দড়ি, আর দুজনের হাতে তলোয়াড়। সায়েব বললেন, বকশী, এই চারটে বড়ি

এখনই গিলে ফেল। আমি বললুম, আগে থাকতেই বিষ খেয়ে মড়ব কেন, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। সায়েব ধমক দিয়ে বললেন, যা বলছি তাই কর, আমি তোমার কমান্ডিং অফিসার, অবাধ্য হলে কোর্ট মার্শালে পড়বে। কি আর করা যায়, বড়ি চারটে গিলে ফেললুম, সায়েবও গিললেন।

বীরেশ্বর সিংগি আঁতকে উঠে বললেন, অ্যাঁ, বিষ খেলেন? তার পর চীনা ফৌজের ডাক্তার এসে বিষ বার করে ফেললে বুঝি ?

—চীনা ফৌজ এক ঘন্টা পর এসেছিল। আমাদের যা হল শুনুন। দুটো জাপানী আমাদের হাত পা বেঁধে ঘাড় নীচু করে বসিয়ে দিলে। আর দুটো জাপানী তলোয়ার দিয়ে ঘ্যাঁচ—

বীরেশ্বর বাবু মাথা চাপড়ে চীৎকার করে বললেন, ওরে বাপরে বাপ!

—হাঁ মশাই, তলোয়ারের চোপ দিয়ে ঘ্যাঁচ করে আমাদের মুন্ডু কেটে ফেললে।

রামতরণ বাবু ক্ষীন কণ্ঠে বললেন, তবে বেঁচে আছেন কি করে?

বজ্রগম্ভীর স্বরে জটাধর বকশী বললেন, কে বললে বেঁচে আছি? আপনার হুকুমে বাঁচতে হবে নাকি? আমাদের কেটে টুকরো টুকরো করলে, ডেকচিতে সেদ্ধ করলে, চেটে পুটে খেয়ে ফেললে, খিদের চোটে স্ট্রিকনিনের তেতো টেরই পেলে না। তারপর তিন মিনিটের মধ্যে সব কটা জাপানী কনভলশন হয়ে পটপট করে মরে গেল। ক্যাপ্টেন ব্যাবিটের মতন বিচক্ষণ অফিসার দেখা যায় না মশাই, অশ্চর্য দূরদৃষ্টি। আচ্ছা আপনারা বসুন, আমি এখন চললুম। ও কালীবাবু, আমার বিলটা রামতরণবাবুই শোধ করবেন। নমস্কার।''[৩২]

জটাধরবাবু এভাবেই তাঁর উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে নিজেকে ভূত হিসেবে প্রতিপন্ন করে সবাইকে বোকা বানিয়ে সেই আড্ডার আসর থেকে সরে পড়ে। এখানেই শেষ নয় আবার কিছুদিন পরে জটাধর বাবু সেই আড্ডার আসরে ফিরে এসেছে এবং তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত কথা দিয়ে সকলের মন জয় করে নিয়েছে। আবার নতুন এক গল্প ফেঁদেছে এবং সকলকে বোকা বানিয়েছে। যাবার আগে সকলের সামনেই 'বারোটা চপ, চারখানা কেক, আর চারটে বড় পেয়ালা চা খেয়েছে, তাছাড়া বউকে দেবে বলে সাতটা চপ পকেটে পুরেছে।'[৩৩]

দ্বিতীয় উদাহরণ হিসেবে 'আতার পায়েস' গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে। গল্পটির উদ্দেশ্য অনাবিল আনন্দ দান হলেও এ আনন্দ সৃষ্টির কৌশলটি যথেষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত। প্রবোধ মাষ্টার ও তার দলবল চুরি করে পেয়ারা পারতে গিয়ে বাড়ির মালিক বৃদ্ধের কাছে ধরা পড়ে যায়। বাড়ির মালিক বৃদ্ধটি একজন রিটায়ার্ড ডিষ্ট্রিকট ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি প্রবোধ মাষ্টার ও তার

দলবলকে প্রচন্ড বকাবকি করলেন। কিন্তু বৃদ্ধের স্ত্রী তাদের ছেলেমানুষিকে সহানুভূতির সঙ্গে উড়িয়ে দিলেন এবং আতার পায়েস রেধে তাদের সমাদর করলেন। আতার পায়েস খেয়ে ছেলেরা বাড়ি ফিরে এসে আবিষ্কার করল যে আতার পায়েস তারা খেয়েছে সেই আতাগুলি তাদেরই বাড়ি থেকে চুরি করা। শুধু 'জটাধর বকশী' কিম্বা 'আতার পায়েস' গল্পই নয় পরশুরামের বহু গল্পেই এরকম বুদ্ধিপ্রধান হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে। তাই প্রমথনাথ বিশী যথার্থই মন্তব্য করেছেন :

> ''বের্গসঁ যাকে ইনটেলেকচুয়াল লাফটার বলেছেন, পরশুরামের হাসি তা-ই। তবে তাঁর হাসির একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, ব্যক্তিবিশেষের বা গোষ্ঠী বিশেষের গায়ে এসে লাগে না। এ হাসি ভূতের ঢিলের মতো সম্মুখে এসে প'ড়ে সচকিত ও সতর্ক করে দেয়, গায়ে লেগে ব্যথা দেয় না। অর্থাৎ হাসির উদ্দেশ্য সাধিত হয় অথচ উদ্দিষ্ট ব্যক্তি পীড়িত হয় না। সেই জন্যে সকলেরই কাছে এর নিত্যসমাদর। অপরপক্ষে অমৃতলাল ও ইন্দ্রনাথের হাসি ব্যক্তি বিশেষ ও গোষ্ঠী বিশেষের পক্ষে পীড়াদায়ক। স্ত্রী শিক্ষা, ইংরেজী শিক্ষা, রাজনৈতিক আন্দোলন, ব্রাহ্মসমাজ এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষ এই হাসির লক্ষ্য। পরশুরামের হাসির লক্ষ্য Idea, Ideology, বৃত্তি, ব্যবসা, সাহিত্য ও ধর্মের ব্যভিচার ইত্যাদি। এ হাসির একটা মস্ত সুবিধা এই যে, প্রত্যেকেই মনে করে সে ছাড়া আর সকলে তার লক্ষ্য, কাজেই অসঙ্কোচে হাসতে তার বাধে না। শেক্সপীয়র নাটককে প্রকৃতির দর্পন বলেছেন। পরশুরামের দর্পনখানা কিছু বাঁকা, দর্শক নিজের বিকৃত ছায়া দেখে বুঝতে না পেরে ভাবে অপরের ছায়া, পেট ভরে হেসে নেয়। সামান্য অতিরঞ্জনের আয়োজন করে পরশুরাম এই কাজটি সুসিদ্ধ করেছেন।''[৩৪]

ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে রাজশেখর বসুর প্রধান পার্থক্যও এ জায়গাতেই। রাজশেখর বসুর প্রধান গুণ বিশুদ্ধ কৌতুকরস সৃষ্টি করার ক্ষমতা। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন :

> ''রাজশেখরবাবুর হাস্যরসের মধ্যে একটা স্বতঃ-উৎসারিত প্রাচুর্য ও অনাবিল বিশুদ্ধি আছে। তাহার রসিকতার প্রবাহ বুদ্ধির বপ্রক্রীড়ায় ঘোলাটে হয় নাই, সূর্য করোজ্জ্বল নির্ঝরের ন্যায় সহজ, সাবলীল, নৃত্যভঙ্গে হাসির ঝিকিমিকি ছড়াইতে ছড়াইতে বহিয়া চলিয়াছে।''[৩৫]

রাজশেখর বসুর এমন কিছু গল্প রয়েছে যেখানে প্রচ্ছন্ন অশ্রু বিদ্যমান। ভূষণ পাল, দাঁড়কাগ, কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প হল এই শ্রেণীর। এই গল্পগুলিতে অশ্রু প্রচ্ছন্ন রয়েছে ঠিকই কিন্তু যে বিশেষ ধরণের দক্ষতায় একটি তীব্রব্যঙ্গাত্মক বিষয় পরিণামে পাঠক মনে অশ্রুর আভাস ঘটায় সে ধরণের গল্প কিন্তু এগুলি নয়। অর্থাৎ এ গল্পগুলিকে উচ্চাঙ্গের হিউমার রসাত্মক

গল্প কিন্তু কিছুতেই বলা যায় না। আসলে পরশুরাম ব্যঙ্গরসের শিল্পী। তাই তাঁর গল্পের মূলসূর একটু তিরষ্কার ঘেষা। ত্রৈলোক্যনাথে তিরষ্কার রয়েছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেই তিরষ্কার অশ্রুতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু পরশুরাম তাঁর তিরষ্কারকে সমবেদনা মিশ্রিত অশ্রুতে পরিণত করতে পারেননি। প্রমথনাথ বিশী এ দুজনের তুলনা করতে গিয়ে বলেছেন :

> ''দুজনেই হাসির গল্পের লেখক বলে পরিচিত, কিন্তু হাসির বর্ণালীর মধ্যে তাঁদের স্থান একত্র নয়। ত্রৈলোক্যনাথ আছেন প্রচ্ছন্ন অশ্রুর দিকে ঘেঁষে আর পরশুরাম আছেন প্রচ্ছন্ন তিরষ্কারের দিকে ঘেঁষে। ত্রৈলোক্যনাথের হাসি প্রধানত প্রচ্ছন্ন অশ্রু ঘেঁষা হলেও তাতে অন্য উপাদান আছে, পরশুরামে মিশ্রণ নেই এমন বলি না, তবে অপেক্ষাকৃত কম। মোটের উপর দাঁড়ালো এই যে, এঁদের একজন আছেন বর্ণালীর লালের দিকে, আর একজন বেগুনীর দিকে। একজনের আবেদন পাঠকের হৃদয়ে, আর একজনের আবেদন পাঠকের বুদ্ধিতে।''[৩৬]

আসলে জগৎ ও জীবনের প্রতি ত্রৈলোক্যনাথ যতখানি হৃদয়বান ছিলেন পরশুরাম ততখানি ছিলেন না। বরং পরশুরাম এক ধরণের নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়েই জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন ও দেখিয়েছেন। একজন প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের মতই মানুষকে তাঁর যথার্থ স্বরূপের মধ্য দিয়েই তুলে ধরেছেন। কোন রকম আবেগে গা ভাসাননি। এর ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই পরশুরামের ব্যঙ্গচিত্রগুলি satire শিল্প হিসেবে উন্নত মানের হলেও Humour শিল্প হিসেবে তাদের আবেদন খুব বেশি নয়। বরং এ বিষয়ে গুরু ত্রৈলোক্যনাথকে এগিয়ে রাখতে হয়।

এবারে আসি বনফুলের প্রসঙ্গে। ত্রৈলোক্যনাথের কবিসত্তার পরিচয় পাওয়া না গেলেও পরশুরাম ও বনফুলের কিন্তু একটি কবিসত্তা ছিল। পরশুরাম রচিত কিছু কিছু কবিতার কথা জানা যায় যদিও সেগুলি খুব উচ্চমানের নয়। অন্যদিকে সাহিত্যক্ষেত্রে বনফুলের আবির্ভাব কবিতা রচনার মাধ্যমেই। যদিও বনফুলের কবিতা রচনা প্রসঙ্গে একথা স্বীকার করতেই হবে যে ব্যক্তিক অনুভূতির গভীরতম রূপ সেগুলিতে নেই। ব্যঙ্গপ্রবণতাই এই কবিতাগুলির প্রধান ও একমাত্র সুর।

এ কারণেই বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গরসিক কবি হিসেবে বনফুল যথেষ্ট সমাদৃত। তাঁর 'কাক', 'আস্তাকুড়ের ফুল', 'শকুনি', 'ঘুঁটে', 'বেগুন ও সেগুন', 'দমকা হাওয়া', 'মার্জার ও মুষিক' ইত্যাদি প্রত্যেকটি কবিতা থেকেই কিন্তু ব্যঙ্গশিল্পী বনফুলকে চিনে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না। কবিতার ক্ষেত্রে যে মানুষটি কৌতুকরসকেই প্রধান অবলম্বন করেছেন ছোটগল্প রচনার সময়ও তিনি তাঁর এই কৌতুক সত্তা বিস্মৃত হতে পারেননি।

তাই তাঁর ছোটগল্পগুলি বিষয় বৈচিত্র্যে বহুধা বিভক্ত হলেও তার বড় একটি অংশ হাস্যরসের গল্প এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বনফুলের ছোটগল্প সম্পর্কে তাই সহজেই মন্তব্য করেছেন :

> ''কথামালা, হিতোপদেশ প্রভৃতি প্রাচীন গল্পসংগ্রহে যেমন গল্পের নীতিকথাটুকুই লেখকের একমাত্র লক্ষ্য, আধুনিক যুগের বনফুলের গল্পে তদনুরূপ ব্যঙ্গাত্মক অসঙ্গতিটুকু ফুটাইয়া তোলাই যেন গল্পরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য দাঁড়াইয়াছে।''[৩৭]

—কবিতায় যে বিষয়গুলিকে স্পষ্টভাবে ধরতে পারেননি সেগুলিকে বনফুল স্পষ্টভাবে প্রকাশ করলেন তাঁর ছোটগল্পে। কখনো কৌতুকের তুলি চালনা করে হাল্কা হাসির আমেজ গড়ে তুললেন, কখনো হাসির ছদ্মবেশে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের কশাঘাত করলেন। তাঁর অনেকগুলি গল্পই যেন বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত জীবনের অসহায়তা, যান্ত্রিক গতানুগতিকতা এবং অস্থির অর্থহীন কৃত্রিমতার প্রতি একজন সহৃদয় লেখকের তীব্র তিরস্কার। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'অজান্তে' গল্পটির কথা মনে পড়ে। আধুনিক মধ্যবিত্ত মানুষের আত্মগত ভালোবাসার এক ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর রূপকে এ গল্পে তুলে ধরেছেন গল্পকার। এক বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় গল্পের নায়ক মাইনে পেয়ে স্ত্রীর বডিস কিনে বাড়ি ফিরছিল ভালোবাসার স্বপ্নে বিভোর হয়ে। গল্পের নায়কের কথায় :

> ''এমন সময় হঠাৎ একটা লোক ঘাড়ে এসে পড়ল। সেও পরে গেল, আমিও পড়ে গেলাম—জামাটা কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল।
>
> আমি উঠে দেখি, লোকটা তখনও ওঠেনি—ওঠবার উপক্রম করছে। রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল, মারলাম এক লাথি।
>
> ''রাস্তা দেখে চলতে পার না শুয়ার?''
>
> মারের চোটে সে আবার পড়ে গেল। কিন্তু কোনও জবাব করলে না। তাতে আমার আরও রাগ হল, আরও মারতে লাগলাম।''[৩৮]

গল্পের নায়ক পরে জানতে পারলেন যে বেচারা লোকটি একটি অন্ধ বোবা ভিখারী। একথা জানার পরে হয়তো এক ধরণের অনুশোচনার ক্ষেত্র তার মধ্যে তৈরী হওয়া সম্ভব কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে তার ভয়ঙ্কর মূর্তিটিও কি আমরা ভুলতে পারি? আধুনিক মানুষের সামান্য স্বার্থহানিতে নিমেষে হিংস্র পশুতে পরিণত হয়ে যাওয়াকে এ ভাবেই তীব্র কসাঘাত করেছেন বনফুল। সেইসঙ্গে মানবিকতার চূড়ান্ত অপমানে চোখের জল ফেলেছেন সেই দৃশ্য অঙ্কণ করে যেখানে দেখি : ''মারের চোটে সে বেচারী কাঁপছে—গাময় কাদা। আর আমার দিকে কাতর মুখে অন্ধ দৃষ্টি তুলে হাত দুটি জোড় করে আছে।''[৩৯]

এ ছাড়াও সমকালীন জীবনের তারুণ্যের স্বভাবজনিত নানা অসঙ্গতিও বিজ্ঞানী মেজাজের সাহিত্যিক বনফুলের ব্যঙ্গ-কটাক্ষের বিষয়। বিভিন্ন কৌণিক দূরত্ব থেকে বিভিন্ন ভঙ্গীমায় সমকালীন জীবনের অসঙ্গতির নানা চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। ব্যঙ্গশিল্পী বনফুল তাঁর ভাবনা ও অনুযোগকে গল্পের সরসতায় তীব্র করে তুলেছেন। বনফুল তাঁর অনুভবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে গোটা বাঙ্গালী জাতিটাই যেন কেমন নিষ্ক্রিয়, নিস্প্রভ হয়ে উঠেছে। বনফুল তাঁর 'অভিভাষণে' (নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের কটকে অনুষ্ঠিত অষ্টাবিংশতি অধিবেশনের সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ।) বাঙ্গালী জাতির প্রতি তাঁর মনোভাব সুস্পষ্টভাবেই তুলে ধরেছেন :

> ''বাঙ্গালী জাতির একটা বৈশিষ্ট্য আছে। অতিশয় আত্মসচেতন জাতি এই বাঙ্গালী। ইতিহাসের পাতা উলটাইলেই প্রতীয়মান হয় যে স্বাধীন রাষ্ট্রস্থাপনের আকাঙ্ক্ষা, নিজের স্বাধীন সত্তাকেই কেন্দ্র করিয়া শৌর্যে-বীর্যে-মহিমায়, রূপে-রসে-রঙে প্রস্ফুটিত হইবার আগ্রহ বহু প্রাচীন কাল হইতেই তাঁহার অন্তরে বদ্ধমূল। এই বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য যুগে যুগে সে প্রাণপাত করিয়াছে, গৌরবের তুঙ্গশীর্ষে আরোহণ করিয়াছে, গ্লানির কর্দমেও অবলিপ্ত লইয়াছে। এই বৈশিষ্ট্য তাহাকে উন্নতির আলোকেও যেমন লইয়া গিয়াছে, অবনতির অন্ধকারেও তেমনি টানিয়া আনিয়াছে।''[৪০]

এই বাঙ্গালী জাতির সন্তান হিসেবে নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কেও তিনি সচেতন। তাই এই অভিভাষণেই তিনি বলেছেন :

> ''আমি রাজনৈতিক নহি, আমি সাহিত্যিক। আমি সেই সরস্বতীর উপাসক, যিনি তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তি, যিনি কুন্দেন্দু-তুষার-হার-ধবলা, সকল বর্ণের সমসম্মিলনে যে শ্বেতবর্ণের উদ্ভব তাহাই সর্বাঙ্গে ধারণ করিয়া যিনি সর্ব-শুক্লা, সর্বসুরের শোভন সমন্বয়ে যে সঙ্গীত তাহারই অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে যিনি বীণাবরদন্ডমন্ডিতভূজা, সর্বজ্ঞানের প্রতীক পুস্তকমালা বাম অঙ্কে ধারণ করিয়া যিনি পুস্তকধারিণী, যাঁহার পদ্মাসন একদল নহে—শতদল, যাঁহার বাহন আকাশচারী মানসসরোবরবাসী, যিনি ভগবতী, নিঃশেষজাড্যাপহা, যিনিব্রহ্মাচ্যুত—শঙ্কর প্রভৃতি দেবৈবন্দিতা, সত্যশিবসুন্দরের এই চিরন্তন প্রকাশপ্রতিমার উপাসনা করিয়া আসিয়াছি বলিয়া আজ মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি যে, আমাদের জীবনে অসত্য অশিব এবং অসুন্দরের ছায়াপাত হইয়াছে। সে ছায়া প্রতিদিন ঘনতর হইতেছে। আমাদের শক্তি ও দুর্বলতার বিচার করিয়া অবিলম্বে আমরা যদি এ

বিষয়ে অবহিত না হই আমাদের সাধনা, সংস্কৃতির জগতে আমাদের কৌলীন্য অবলুপ্ত হইয়া যাইবে।''[৪১]

এই আত্মপ্রবঞ্চনাপরায়ণ জাতির মিথ্যা অহংকারকে বনফুল ক্ষুরধার ব্যঙ্গে আঘাত করেছেন। বিদ্রূপের সূক্ষ্ম হুল ফুটিয়ে তাদেরকে আত্মসচেতন করতে চেয়েছেন। শুধু তাই নয় ভারতবাসীর যুক্তিহীন প্রতীচ্যঘেষা মানসিকতাকেও তিনি কটাক্ষ করেছেন। প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ যখন স্ব স্ব চেতনার দ্বারা উদ্বোধিত হয়ে নবজাগ্রত স্বদেশ গঠনের প্রেরনায় অনুপ্রাণিত হয়ে চলেছে তখন বাঙ্গালীরা হয়ে উঠেছে পাশ্চাত্ত্যের দুর্বল অনুকরণ বিলাসে মত্ত। বাঙ্গালীর এই মানসিকতায় বনফুল ব্যথিত হয়েছেন। তাঁর বহু ছোটগল্পই এই বেদনার অন্তঃস্থল থেকে উঠে এসেছে।

বনফুলের এক ধরণের গল্প রয়েছে যেখানে মানব চরিত্রের দুর্বলতা ও ত্রুটির বিরুদ্ধে তাঁর আঘাত বক্র হাসির মিশ্রণে ধারালো হয়ে উঠেছে। এ ধরণের ব্যঙ্গাত্মক গল্পের মধ্যে 'শ্রীপতি সামন্ত' অন্যতম। আলোচ্য গল্পে লেখক পাশাপাশি দুটি পরস্পর বিরোধী চরিত্র নির্মাণ করেছেন। একদিকে শ্রীপতি সামন্ত খুবই সাদামাটা লোক যার পরনে একটি আধময়লা থান, খালি গা। পায়ে ধূলি ধূসরিত একজোড়া দেশি মুচির তৈরি চটি। অন্যদিকে সাহেবি পোশাক পরিহিত বাঙ্গালীবাবু। এই বাঙ্গালীবাবুর ভন্ডামির মুখোস খুলে দিয়েছেন বনফুল। 'বিদ্যাসাগর' গল্পেও মানুষের বিচারবোধহীন অন্ধবিশ্বাসকে এক হাত নিয়েছেন বনফুল। এ রকম বহু গল্পের উল্লেখ করা যায় যেখানে বনফুল একজন নির্মম ব্যঙ্গশিল্পী।

বনফুলের হাস্যরসের গল্প সবই যে ব্যঙ্গধর্মী তা নয়, বরং কিছুটা কৌতুক, কিছুটা হিউমার ও হাল্কা হাসি—এ নিয়েই নির্মিত হয়েছে তাঁর গল্পগুলি। জীবন রঙ্গমঞ্চে হাসি ও কান্না, সুখ ও দুঃখ, আনন্দ ও বেদনা যে পাশাপাশি বিরাজ করে বনফুল তা জানতেন। আর জানতেন বলেই তিনি লিখতে পেরেছেন :

'একই বাণী, ওগো রসিক,
বলছ তুমি নানান সুরে সুরে,
সামনে যখন বৃষ্টি ঝরে, দেখি
রোদ উঠেছে দূরে।' [৪২]

এ ছাড়া বহু গল্প রয়েছে বনফুলের যেখানে মুখে হাসি চোখে জল, অর্থাৎ হাসির হাল্কা চালে গল্প শুরু হলেও, শেষ হয়েছে করুণাদ্র ভঙ্গীতে। যেমন.... 'ক্যানভাসার', 'গণেশ', 'ভিতর ও বাহির', 'বেচারাম বাবু', 'অদূরদর্শী নিমাই', 'চতুরীলাল', 'নীলকণ্ঠ' ইত্যাদি গল্প।

জীবন সম্পর্কে যে তির্যক বিশ্লেষণী, ক্ষুরধার ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকলে সার্থক ব্যঙ্গ সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় সে দৃষ্টিভঙ্গী বনফুলের ছিল। সেই সঙ্গে আরেকটি জিনিস মনে রাখতে হবে যে বনফুল ছিলেন জীবনবাদী শিল্পী। তিনি মোরালিষ্ট। এই Morality বনফুলকে একজন বড় Satirist-এ পরিণত করেছে। মানুষের যে সমস্ত অসঙ্গতি আছে সে সমস্ত অসঙ্গতিগুলিকে বনফুল একজন বৈজ্ঞানিকের মতই পর্যবেক্ষণ করেছেন। মানুষের জীবনে নানা অসঙ্গতি তাঁর পরিহাসপ্রবণ মনে প্রবল কৌতুকরসের সঞ্চার করে। প্রমথনাথ বিশী বনফুলের ব্যঙ্গ সৃষ্টির কৌশল নিয়ে লিখেছেন :

> ''সংসার ও জীবনে যে-সব গরমিল আছে, paradox আছে, সেগুলিকে তিনি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া মিশাইয়া দেন, অমনি হাসির বিস্ফোরণ ঘটে। সেই বিস্ফোরণের চমকে ও আওয়াজে সকলে শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া নিজ নিজ অসঙ্গতির সন্ধান করে, অসঙ্গতিগুলিকে সংশোধন করিতে, পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করে। [৪৩]

এর পাশাপাশি বনফুলের বহু গল্প রয়েছে যেখানে ব্যঙ্গ প্রবণতার মধ্য থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে মানবদরদী শিল্পী বনফুল। এ গল্পগুলিতে ব্যঙ্গ থাকলেও তা প্রধান ও একমাত্র সুর নয়। 'অদ্বিতীয়া', 'মিঃ মুখার্জি', 'অজান্তে', 'সমাধান', 'ছেলে ও মেয়ে', 'জৈবিক নিয়ম' এ ধরণের গল্প। এ গল্পগুলিতে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ রয়েছে কিন্তু সেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপের অন্তরালে মানুষের অসহায়তার প্রতি বনফুলের সহৃদয় কারুণ্যমিশ্রিত মমত্ববোধ আশ্চর্য রসব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে।

'মিঃ মুখার্জী' গল্পে মিষ্টার মুখার্জী মুখে যতই বড় বড় গালভরা বক্তৃতা করুক না কেন যখন দেখা যায় যে তিনি একটা অন্ধকার গলির মোড়ে ব্যাগ নিয়ে সদানন্দ মোদক বিক্রি করছেন এবং ধরা পড়ে গিয়ে তিনি অনুরোধ করছেন : ''এ কথা যেন বলবেন না কাউকে। সবাই হয়তো জিনিসটা ঠিক বুঝবে না। ভাববে হয়তো অভাবে পড়েই-'' [৪৪] তখন হাসির আবহাওয়া মুহূর্তে বেদনার মেঘে পরিণত হয়। অথবা বলা যেতে পারে 'জৈবিক নিয়ম' গল্পের বেচারা ছেলেটির কথা। যৌবনের উত্তেজনায় হয়তো সে একটু বেশীই বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল। কিন্তু চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে পা ফসকে গিয়ে তার চাকার নীচে পড়ে যাওয়ার মধ্যে ব্যঙ্গ যতই থাক তার মধ্যে মিশে আছে লেখকের সমবেদনার অশ্রু। অথবা উল্লেখ করতে হয় 'পাশাপাশি' গল্পটির কথা। এই গল্পটির নায়ককে দেখে আপাতদৃষ্টিতে একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন পলায়নবাদী

পিতার কথা মনে পড়লেও এর অন্তরালে রয়েছে একজন অসহায় পিতার করুণ প্রতিচ্ছবিও। তাই অনায়াসেই সে বলতে পারে—

> ''বাড়িতে থাকলেই গোলমাল। বুঝলেন না। সেদিন রাত্রে গিয়ে শুনলাম ছোট ছেলেটার পড়ে গিয়ে মাথা ছেঁচে গেছে। নাক দিয়ে রক্তও পড়ছিল প্রচুর। বাড়িতে থাকলে হৈ হৈ করে একটা ডাক্তার-ফাক্তার ডাকতে হত ধার করেও। ছিলাম না—নিশ্চিন্ত।''[৪৫]

—এই উক্তি কি একজন অসহায় পিতার কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয় না? দুর্ভাগ্য তার পুত্রেরও। কিন্তু এই দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী কে? সত্যিই বনফুলের এই গল্প পাঠককে ভাবায়, সমাজ সমস্যার গভীরে পাঠককে নিয়ে যায়।

তিনজন গল্পলেখকই জীবনের অসঙ্গতিটুকু ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গীতে গল্পে তুলে ধরেছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধায় বনফুলের গল্প সম্পর্কে বলেছেন :

> ''কথামালা, হিতোপদেশ প্রভৃতি প্রাচীন গল্পসংগ্রহে যেমন গল্পের নীতিকথাটুকুই লেখকের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, আধুনিক যুগের বনফুলের গল্পে তদনুরূপ ব্যঙ্গাত্মক অসঙ্গতিটুকু ফুটাইয়া তোলাই যেন গল্পরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য দাঁড়াইয়াছে।''[৪৬]

সবশেষে বলতে হয় ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরামের বহুগল্প যেভাবে পাঠককে হাল্কা হাসির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে সাহায্য করে বনফুলের গল্প সে রকম নয়। হাল্কা হাসির স্রোতে পাঠককে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো হাস্যরসের গল্প বনফুল সেভাবে লেখেননি বললেই চলে। প্রথম থেকেই বনফুল যেন উদ্দেশ্যপ্রবণ। উদ্দেশ্যের প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে একটিও বাড়তি শব্দ খরচ করেননি বনফুল। ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরামের থেকে এখানেই বনফুল আলাদা।

সুতরাং বলা যায় যে ত্রৈলোক্যনাথ, পরশুরাম ও বনফুল তিনজন গল্পলেখকেরই হাস্যরসের মূল অবলম্বন ব্যঙ্গ। যদিও ব্যঙ্গবান নিক্ষেপের ব্যাপারে এই তিনজন শিল্পীর অবস্থান এক নয়। যেমন পরশুরামের ব্যঙ্গ কখনোই খুব নির্মমভাবে প্রকাশিত হয়নি। আর এ ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যনাথ ও বনফুল দুজনেই সমানভাবে নির্মমতা প্রদর্শন করেছেন। ত্রৈলোক্যনাথের মুক্তামালা গল্পগ্রন্থের গুরুদেব চরিত্রের কার্যকলাপ তো নিষ্ঠুরতার চরম সীমা প্রদর্শন করেছে। প্রায় একইরকম নিষ্ঠুরতার চিত্র অঙ্কণ করেছেন বনফুল তাঁর 'কশাই' গল্পে। এত নিষ্ঠুর গল্প বাংলা সাহিত্যে বোধহয় আর একটিও নেই। ত্রৈলোক্যনাথ 'মুক্তামালা'র গুরুদেব অথবা 'ঢাক মহাশয়' গল্পে মানুষের নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত পর্যায় অঙ্কন

করেছেন। কিন্তু বনফুল সেই নিষ্ঠুরতার পর্যায়কেও ছাপিয়ে গেছেন 'কশাই' গল্পে। অর্থাৎ এই দুজনেই ব্যঙ্গ প্রদর্শনের ব্যাপারে প্রয়োজনে নির্মম ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছেন। পার্থক্যও আছে। ত্রৈলোক্যনাথ যেভাবে খুঁটিনাটি বর্ণনার মধ্য দিয়ে মানুষের নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছেন তাতে তাঁর গল্পগুলি হয়ে উঠেছে ব্যঙ্গচিত্র। আর বনফুলে প্রত্যক্ষ বর্ণনা কিছুই নেই। শুধুমাত্র কলমের দুএকটি আচড়ে ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে পাঠক হৃদয়ে তা অনুভববেদ্য করেছেন। যেমন ধরা যাক তাঁর 'কশাই' গল্পটির কথা :

''পুরোহিত যেমন নির্বিকার চিত্তে ফুল তোলে, লেখক যেমন অসঙ্কোচে সাদা কাগজে কালির আঁচড় টানে, রাঁধুনি অবিচলচিত্তে যেমন জীবন্ত কইমাছগুলো ভাজে ফুটন্ত তেলে, রহিমও তেমনি ছাগল কুচো করে অকুণ্ঠিত দক্ষতা সহকারে। একটুও বিচলিত হয় না।

একটা খাসি, একটা পাঁঠা, গোটা দুই বক্‌রী প্রত্যহ জবাই করে সে। আধ সের পাঁঠার মাংস দুলালবাবুর বাপকে দিতে হয়। সুদস্বরূপ। কবে পাঁচশ টাকা ধার নিয়েছিল তা আর শোধই হচ্ছে না। ভিটেমাটি সবই বাঁধা আছে। সুদের সুদ তার সুদ—হিসাবের মার-প্যাঁচে বিভ্রান্ত হয়ে শেষে এই সোজা হিসাবে রাজী হয়েছে সে। রোজ আঁধসের কঁচি পাঁঠার মাংস। চতুর্থপক্ষের অনুরোধে শালাও রাজী হয়েছে।

কিন্তু এ-ও আর পেরে উঠছে না রহিম। এই দুর্মূল্যের বাজারে রোজ কঁচি পাঠা জোটানো কি সোজা কথা! এ অঞ্চলের যত কঁচি পাঠা ছিল সব তো ওই শালার পেটে গেল। রোজ কঁচি পাঠা পায় কোথা সে। অথচ শালাকে চটানো মুশকিল। এক নম্বর হারামি। হেলথ অফিসারটা পর্যন্ত ওর হাত-ধরা.....ওর কথায় ওঠে বসে। একটু ইঙ্গিত পেলেই সর্বনাশ করে দেবে।....সেদিন সমস্ত দিন রোদে ঘুরে ঘুরে রহিম হতাশ হয়ে পড়ল। একটু ভয়ও হল তার। কচি-পাঁঠা কোথাও পাওয়া গেল না। কী হবে কে জানে!

হঠাৎ মাথায় খুন চড়ে গেল তাঁর। চতুর্থ পক্ষে বিয়ে করেছে শালা! কচি-পাঁঠার ঝোল খাবে রোজ। হারামির বাচ্চা।

চিবুকের কটা দাড়িগুলো সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠল!

তার পরদিন বাবুর বাবুর্চি বললে এসে—''কাল তুই যে মাংস দিয়েছিলি একেবারে ফাস্‌ট কেলাস। খেয়ে বাবুর দিল তর হয়ে গেছে। চেটেপুটে খেয়েছে সব—''

রহিম নীরব।

কেবল দাড়ির গোটা কয়েক চুল নড়ে উঠল। বাবুর্চি বলতে লাগল :

''খোকাটাকে কাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না তাই বাবুর মনে সুখ নেই, তা না হলে তোকে ডেকে বকশিশই দিত হয়তো। পাশের গলিতে খেলছিল—কোথায় যে গেল ছেলেটা। বাবু বলছে, যে খুঁজে দিতে পারবে তাকে পঁচিশ টাকা বকশিশ দেবে। একটু খোঁজ করিস, বুঝলি.....কিরে কথা কইচিস না কেন...''

রহিম পচ্ করে একবার থুতু ফেলে নীরবে মাংস কুচোতে লাগল। তার চোখ দিয়ে আগুনের হলকা বেরুচ্ছিল!''[৪৭]

এ রকম ইঙ্গিতধর্মীতা পরশুরামের কিছু গল্পে লক্ষ করা গেলেও ত্রৈলোক্যনাথে তা আমরা প্রত্যক্ষ করি না।

ভাষারীতির দিক থেকেও এই তিনজন গল্পকারের বিশিষ্টতা রয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথ বাংলাভাষা ছাড়াও অনেকগুলি ভাষা জানতেন। ওড়িয়া, হিন্দী, পার্শী, উর্দূ এবং সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। তবে ত্রৈলোক্যনাথের রচনার ভাষা একেবারেই পান্ডিত্যপূর্ণ নয়। বরং তাঁর ভাষা ছিল একেবারেই অনাড়ম্বর ও ঋজুগতি সম্পন্ন। প্রমথনাথ বিশী ত্রৈলোক্যনাথের ভাষা সম্পর্কে বলেছেন :

''এই জীবন দর্শন-প্রকাশের বাহন তাঁর ভাষা। তাঁহার ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সম্পদ ও অলৌকিক মহিমা আশা করা বৃথা। এই ভাষার প্রধান ঐশ্বর্য শরবৎ ঋজুগতি। ঋজুতাই ব্যঙ্গের প্রধান সম্পদ। ভাষা যদি ঋজু না হয় তবে ব্যঙ্গের প্রচন্ডতার অনেকটাই মাঝপথে নষ্ট হইয়া যায়।''[৪৮ক]

—ত্রৈলোক্যনাথ জানতেন শক্তিশালী ব্যঙ্গ সৃষ্টি করার জন্য ভাষাকে সেই পরিমাণেই ঋজুগতি সম্পন্ন করে তুলতে হয়। তাই তাঁর ভাষা যতটা ঋজুগতিসম্পন্ন ততটা অলঙ্কারবহুল নয়। ভাষাকে তিনি যতটা পেরেছেন স্নিগ্ধ ও আস্বাদ্যমান করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ব্যাবহৃত ভাষা ছিল সাধুভাষা, অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ভাষার মিল লক্ষ্য করা যায়। তবে সে ভাষা বঙ্কিমের মত পান্ডিত্যপূর্ণ নয়। ত্রৈলোক্যনাথ সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন ঠিকই কিন্তু সেভাষা অনেকটা লৌকিক ভাষার মত। সাহিত্য সমালোচক অর্ধেন্দু বিশ্বাস বলেছেন :

''লৌকিক বাক্ভঙ্গিই তাঁর ভাষারীতির বড় সম্পদ। যখন বঙ্কিম প্রবর্তিত ভাষারীতিই সাহিত্য রচনার আদর্শ এবং কালোচিত আধুনিক, তখন তাঁর প্রভাব বর্জিত থেকে লৌকিক বাক্ভঙ্গীকে অনুসরণ করে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করা তাঁর

মতন শক্তিশালী লেখকের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। বিষয়োপযোগী বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব ভাষাভঙ্গির যাদুদন্ডটি অতিশয় সক্রিয় ছিল।''[৪৮খ]

তিনি আরো বলেছেন :

''তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং বিষয়বস্তুর প্রতি সরল আন্তরিকতা তাঁর ভাষাকে স্নিগ্ধ ও আস্বাদ্য করে তুলেছে। তিনি ভাষা ব্যবহারে ছিলেন অত্যন্ত সংযত। আবেগ ও উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে কখনও তিনি অতিকথন ও অসংগতির আশ্রয় নেননি।''[৪৯]

সুতরাং বলা যেতেই পারে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যনাথ একটি নিজস্ব ষ্টাইল নির্মাণ করে নিয়েছিলেন। এই নিজস্বতা ছিল বনফুলেরও। ভাষাব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি যেমন সাধুভাষা ব্যাবহার করেছেন তেমনি চলিতভাষাও ব্যবহার করেছেন। 'বাড়তি মাশুল', 'অমলা', 'খেঁদি', 'আত্ম-পর', 'একফোঁটা গল্প', 'অজান্তে', 'কশাই'-এর মত বিখ্যাত গল্প তিনি যেমন চলিত ভাষায় লিখেছেন তেমনি 'চোখ গেল', 'বেচারাম বাবু', 'সমাধান', 'যুগান্তরে'র মত জনপ্রিয় গল্পগুলি তিনি লিখেছেন সাধু ভাষায়। এই দুরকম ভাষাতেই গল্প রচনায় তিনি ছিলেন সমান স্বচ্ছন্দ। অবশ্য তাঁর ঝোঁক ছিল চলতিভাষার দিকেই। তাই তাঁর ব্যবহৃত সাধুগদ্যও চলিতভাষার গন্ধযুক্ত। সাধুভাষার গাম্ভীর্যতা একেবারেই সেখানে নেই। তবে সাধু বা চলিত যে ভাষাতেই তিনি গল্প রচনা করুন না কেন তাঁর গল্প ভাষায় মিশ্রিত হয়ে রয়েছে এক কাব্যিক অনুভূতি। এ বিষয়টি নজরে পড়েছিল সুকুমার সেনেরও। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন :

''তিনি উপন্যাসকার, নাট্যকার ও গল্প লেখক (অর্থাৎ ''গদ্য'' লেখক) বলেই সকলে তাঁকে জানেন। (এখানে তাঁর চমৎকার ব্যঙ্গ কবিতাগুলির কথা ধরছি না।) কিন্তু বলাইবাবুর রচনায় কবিতার ভাগ মোটেই কম নয়। তাঁর কোন-কোন রচনায় গদ্যরীতি ও পদ্যরীতি সমানভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন কিছু পরিমাণে করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা'য়। বলাইবাবুকে আমরা এখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ চম্পূ-লেখক বলতে পারি।''[৫০]

বনফুলের অধিকাংশ গল্পের ভাষাতেই এই কাব্যিক অনুভূতির প্রকাশ লক্ষ করা যায়। একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে 'মৃন্ময়' গল্প থেকে :

''সেদিন রাত্রে সেই ছেলেটির সঙ্গে পাশাপাশি শুয়ে মৃন্ময়ের সারা বুক যে আনন্দে ভরে উঠলো, তেমন আনন্দ তার জীবনে কখনও হয়নি। এমন কি ভূপেনকে হারিয়ে যেদিন সে ফার্স্ট হয়েছিল সেদিনও না। একটা জিনিস কেবল

খুব খারাপ লাগছিল তার। মা তাকে অর্ধেক খাবার দেননি, সে রোজ যেমন খায়, সেদিনও তাকে তেমনি খেতে হয়েছিল। সে আপত্তি করাতে মা ধমকে উঠলেন। মা কি যে মনে করেন তাকে। সে কি আধপেটা খেয়ে থাকতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে!''[৫১]

—এ ভাষার পরতে পরতে ছরিয়ে রয়েছে কাব্যিক অনুভূতি। রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা' ও 'লিপিকা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি যেমন পদ্যে রচিত গল্পসমষ্টি অথবা ছন্দময় গদ্যে রচিত গল্পসমষ্টি তেমনি বনফুলের প্রচুর গল্প রয়েছে যেগুলি ছন্দময় গদ্যে রচিত গল্পসমষ্টি হয়ে উঠেছে। এগুলির ভাষা আপাতদৃষ্টিতে গদ্য হলেও কবির তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে এ গল্পগুলিকে লিরিক অনুভূতি দান করেছে।

আর পরশুরামের গল্পের ভাষা ত্রৈলোক্যনাথ ও বনফুলের মাঝামাঝি। ত্রৈলোক্যনাথ যে বঙ্কিমিধরণের সাধুগদ্যে নিজের ভাষাশৈলী নির্মাণ করে নিয়েছিলেন পরশুরামের ভাষাশৈলী সে ভাষাশৈলীর কাছাকাছি হয়েও কোথায় যেন একটু আলাদা। প্রমথনাথ বিশী বলেছেন : ''গড্ডলিকা ও কজ্জলীর ভাষারীতি সাধু, তবে জটাধারী ভেকধারী সাধু নয়, এমন সাধু যে সাধুত্ব গোপন রাখতে সমর্থ।''[৫২] পরশুরামের সাধুগদ্য অনেকটাই কথ্যভাষার কাছাকাছি। ভাবের স্বাভাবিক বাহন হিসেবে এ গদ্য সত্যিই তুলনাহীন। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে সাধুগদ্যে হাস্যরস যতটা খোলে চলিতগদ্যে ততটা নয়। প্রমথনাথ বিশী বলেছেন :

''হাস্যরস রচনার ভাষা সাধু হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাতে ভাষার গাম্ভীর্যে আর ভাবের লঘুতায় যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তা হাসির পরিবেশ রচনায় সাহায্য করে। কথ্যভাষার চটুলতা আর হাসির চটুলতায় মিলে যায়, মুহুর্মুহু পাঠকের মনকে দ্বন্দ্বের চকমকি স্ফূরণে আলোকিত ও চকিত করতে পারে না।''[৫৩]

হয়তো এ কারণেই প্রমথ চৌধুরীর চলিতভাষার প্রবল প্রতাপের যুগে আবির্ভূত হয়েও ক্রমশ অপসৃয়মাণ সাধু ভাষাকেই পরশুরাম প্রথম প্রথম গল্প লেখার বাহন করেছেন। তবে চলিতভাষাকে সম্পূর্ণ বাদ দেননি তিনি। যতক্ষণ গল্পকথকের ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ থাকেন ততক্ষণ এ ভাষা সাধু কিন্তু গল্পের চরিত্ররা যখন কথা বলে তখন তারা কথ্য ভাষাতেই জোড় দেন। ফলে একইসঙ্গে সাধু ও চলিত গদ্যের এক অপূর্ব মিশেল তৈরী হয়েছে তাঁর গল্পে। পরশুরামের গল্প থেকে একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে :

''হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে কোম্পানির বাৎসরিক লাভ অন্ততঃ ১২ লক্ষ টাকা হইবে। এবং অনায়াসে ১০০ পারসেন্ট ডিভিডেন্ট দেওয়া যাইবে। ৩০ হাজার

শেয়ারের আবেদন পাইলে অ্যালটমেন্ট হইবে। সত্বর শেয়ারের জন্য আবেদন করুন। বিলম্বে এই সুবর্ণসুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন।

গন্ডেরি। লিখে লিন—ঢাই লাখ টাকার শেয়ার বিক্রি হয়ে গেছে। হামি একলাখ লিব, বাকী দেড় লাখ শ্যামবাবু বিপিনবাবু অটলবাবু সমান হিস্সা লিবেন।

শ্যাম। পাগল আর কি! আমি আর বিপিন কোথা থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা বার করব ? আপনারা না হয় বড়লোক আছেন।

গন্ডেরি। হামি-শালা রুপয়া ডালবো আর তুমলোগ মৌজ করবে? সে হোবে না। সব্কা ঝোঁখি লেনা পড়েগা। শ্যামবাবু মতলব সমঝ্লেন না? টাকা কোই দিব না। সব হাওলাতী থাকবে। মেনেজিং এজিন্ট মহাজন হোবে।

অটল। বুঝলেন শ্যাম-দা? আমরা সকলে যেন ম্যানেজিং এজেন্টস্দের কাছ থকে কর্জ ক'রে নিজের নিজের শেয়ারের টাকা কোম্পানিকে দিচ্ছি; আবার কোম্পানি ঐ টাকা ম্যানেজিং এজেন্টস্দের কাছে গচ্ছিত রাখছে। গাঁট থেকে এক পয়সাও কেউ দিচ্ছেন না, টাকাটা কেবল খাতা পত্রে জমা থাকবে।''[৫৪]

ত্রৈলোক্যনাথে এ ধরণের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায় না। এমনকি তাঁর অঙ্কিত ভূতেরাও সাধুভাষাতেই কথা বলে। যেমন :

''খাঁদা ভূতের বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য সকলেরই কৌতূহল জন্মিয়াছিল। বিনয় তাহাকে বসিতে বলিলেন। উপবেশন করিয়া সে আপনার বৃত্তান্ত এইরূপে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল।—

''ভূত হাসিয়া বলিল,—''একথা তোমরা কিছুই জান না। লোকে বলে, অমুক মানুষ মরিয়া ভূত হইয়াছে। ঠিক সেটি সত্য নয়। মানুষ নিজে মরিয়া নিজের ভূত হয় না। মানুষ মরিলে আমরা কেহ গিয়া তাহার ভূতগিরি করি। লক্ষ লক্ষ ভূত পৃথিবীতে অবস্থিতি করিতেছে। কেহ বা ভূতগিরি করিবার কর্ম্ম পাইয়াছে, কেহ বা ভূতগিরি করিবার উমেদারি করিতেছে, আবার কেহ বা বেকার বসিয়া আছে। আমাদের যিনি কর্ত্তা তিনিই ভূতদিগকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করেন।''...''[৫৫]

তুলনার ক্ষেত্র আরো রয়েছে। সাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর বিচিত্র জীবনের মতই বহির্মুখী। ব্যক্তি মানুষের অন্তরপ্রদেশে যে বিপুল বেদনার স্রোত বয়ে চলে অথবা কান্না হাসির দোল দোলানো ব্যক্তি মানুষের যে সহজ সরল জীবন তা ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে পাওয়া যায় না। বরং তাঁর গল্পের প্রায় সবটাই জুড়ে আছে সামাজিক মানুষ, কোন একক মানুষ নয়।

ত্রৈলোক্যনাথের অঙ্কিত চরিত্রেরা তাই সমাজের একটি বৃহৎ মানুষকে তুলে ধরে। গুরুদেব, বীরবালা, লুল্লু, নয়নচাঁদ প্রমুখ ত্রৈলোক্যনাথ অঙ্কিত চরিত্রেরা নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ-দু:খের কথা অথবা ব্যক্তি চরিত্রের বিভিন্ন অসঙ্গতিকে তুলে ধরেনি। তারা প্রত্যেকেই সমাজের বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছে। কিন্তু বনফুলের গল্পে আমরা ব্যক্তি মানুষকে খুঁজে পাই। ব্যক্তি মানুষের জীবনের নানা অসঙ্গতি বিকার-বিচ্যুতি যা তাঁর নজরে এসেছে তাকেই তিনি কৌতুক-হাস্যে রূপদান করেছেন। তাই বলা যায় জীবনের চিত্র রূপায়ণে সাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথ যেখানে বহির্মুখী সেখানে বনফুল অনেকটাই অন্তর্মুখী। এ ক্ষেত্রে পরশুরামে দেখি মিশ্রণ। তিনি সমাজিক মানুষকেও যেমন তাঁর গল্পে ধরেছেন তেমনি ব্যক্তি মানুষের জীবনের নান অসঙ্গতিকেও রূপদান করেছেন তাঁর গল্পে। হাস্য-কৌতুক ও রঙ্গ-ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে সামাজিক অসঙ্গতির সূত্র ও কারণগুলিকে মানুষের বোধগম্য করার চেষ্টা করেছেন। পরশুরামের 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড, 'চিকিৎসা সঙ্কট', 'জাবালি', 'কচি সংসদ', 'তৃতীয় দ্যূতসভা' ইত্যাদি গল্প যদি সামাজিক মানুষের বা সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষের চিত্রায়ণ হয় তাহলে 'ভূষণ পাল', 'দাঁড়কাগ', 'কৃষ্ণকলি' ইত্যাদি গল্পগুলির অবলম্বন যে ব্যক্তিমানুষের সংগতি-অসংগতি জনিত টুকরো টুকরো জীবনচিত্র সে কথা বলাই যায়।

সাধারণতঃ হাস্যরসিকেরা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হন বলে তাদের রচনায় প্রায় প্রচারধর্মিতা এসে পরে যা সাহিত্যের একটি বিশেষ ত্রুটি হিসেবেই পরিগণিত হয়। প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্যটি এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> ''ব্যঙ্গ উদ্দেশ্যমূলক শিল্প, অর্থাৎ ইহাকে একপ্রকার প্রচার সাহিত্য বলা যাইতে পারে। মনুষ্যত্বের অনুকূলে ব্যঙ্গ চিরকাল প্রচারকার্য চালাইয়া যাইতেছে। কিন্তু মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। যে লোকটা স্বেচ্ছাকৃত নকিব হইয়া তারস্বরে তাহার পক্ষে প্রচারকার্য চালাইয়া যাইতেছে তাহাকে দ্বারের কাছেই রাখিয়া দেয়, আর যে কবিতা তাহার কানে-কানে স্বর্গীয় প্রলাপ-বাণী ঢালিতে থাকে, সাংসারিক প্রয়োজনসাধনে যে-প্রলাপের কিছুমাত্র উপকারিতা নাই, সেই স্বর্গীয় প্রলাপবাদিনীকে অন্ত:পুরের গোপন কক্ষে ল ইয়া গিয়া আদর করিয়া বসায়। সকল দেশে সকল কালেই কবিতার স্থান ব্যঙ্গের অনেক ঊর্ধ্বে।''[৫৬]

ত্রৈলোক্যনাথের রচনায় এই প্রচারধর্মিতা লক্ষ্য করা গেলেও তা শিল্প হয়ে উঠতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ত্রৈলোক্যনাথ অত্যন্ত সুকৌশলে তাঁর সাহিত্যের মধ্যে প্রচারধর্মিতাকে বিন্যস্ত করেছেন। তাই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্যে প্রচারধর্মিতার কথা স্বীকার করে নিয়েও বলেছেন ''...কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর উদ্দেশ্যকে রসসৃষ্টির সঙ্গে উপযুক্তভাবে বিন্যস্ত

করেছেন—তারা আগে শিল্প হয়ে উঠেছে—তারপর প্রচার করেছে। ''It must be work of art at first.''[৫৭] পরশুরামের সাহিত্যে এই প্রচারধর্মিতা প্রায় নেই বললেই চলে অথবা থাকলেও তা এমনভাবে মূল গল্পের সঙ্গ মিশে থাকে যে আলাদাভাবে তার আর অস্তিত্বই থাকে না। গল্প আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রচারধর্মিতার আসল বক্তব্য পাঠকের অনুভূতির সঙ্গে মিশে গিয়ে তাকে একটি সমগ্র সৃষ্টি করে তোলে। আর বনফুলের গল্পে এই প্রচারধর্মীতা একেবারেই নেই । উদ্দেশ্য তাঁর মধ্যেও কাজ করেছিল কিন্তু সাহিত্যকে তিনি কখনোই প্রচারের বাহন করে তোলেননি।

ত্রৈলোক্যনাথ, রাজশেখর বসু ও বলাইচাঁদ তিনজনই স্বদেশপ্রেমিক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনজনই দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার চিত্রকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তবে তিনজনের কেউই প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তাই সেভাবে কোন বিশেষ মতবাদের প্রতি সমর্থন তাদের কারোর গল্পে প্রায় নেই বললেই চলে। ত্রৈলোক্যনাথ যখন গল্পলেখার আসরে আসর জমিয়েছেন তখন দেশ পরাধীন, স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য দেশ প্রস্তুত হচ্ছে। ত্রৈলোক্যনাথ ভারতবাসী হিসেবে পরাধীন জাতির মর্মযন্ত্রণা উপলব্ধি করেছেন। তিনি নিজে সেই আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেননি ঠিকই কিন্তু স্বদেশপ্রেমের ভন্ডামী যা প্রকৃত স্বাধীনতা আন্দোলনের পথে অন্তরায় তাকে ব্যঙ্গ করেছেন। কিছু মানুষ স্বদেশী আন্দোলনের আবেগকে কাজে লাগিয়ে স্বদেশী কোম্পানী তৈরী করে যে লোক ঠকানোর আয়োজন করে তাদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন তিনি 'স্বদেশী কোম্পানী' গল্পে। আবার স্বদেশী ছেলে খেকো বক্তাকে বিদ্রূপ করেছেন এরকমভাবে:

> '' কানে আঙ্গুল দিয়া ইঁহার নিকট আমি গমন করিলাম। ইঁহার অপর কেহ শ্রোতা ছিল না। কিন্তু একখন্ড অন্ধকারের উপর দাঁড়াইয়া রাত্রিদিন ইনি বক্তৃতা করেন। শুনিলাম যে, পাতালে অসুরদিগের কানে পোকা হইলে, তাহারা ইহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আগমন করে। পাঁচ মিনিট কাল ইঁহার বক্তৃতা তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলেই কানের পোকা ধড়ফড় করিয়া বাহির হইয়া যায়।''[৫৮]

—এর বাইরে রাজনৈতিক প্রসঙ্গের কথা ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে আমরা পাই না। অন্যদিকে রাজনীতির প্রসঙ্গ নিয়ে বনফুল অনেকগুলি উপন্যাস ও কবিতা লিখলেও ছোটগল্পের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ সেভাবে আনেননি। 'পলিটিক্স আপ-টু ১৯৪০', 'অন্নদাশঙ্কর', 'রামরাজ্য ১৩৫৬' প্রভৃতি কবিতায় বনফুল যেমন সমকালীন রাজনীতির বিভিন্ন দিককে ব্যঙ্গ করেছেন তেমনি 'সপ্তর্ষি' 'অগ্নি' প্রভৃতি উপন্যাস রচিত হয়েছে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলন ও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে।

এরকম রাজনৈতিক প্রসঙ্গকে ব্যঙ্গ করে বনফুল একটিও গল্প লেখেননি। ত্রৈলোক্যনাথ ও বনফুলের গল্পে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ সেভাবে উচ্চারিত না হলেও পরশুরামের অনেক গল্পই আছে যেখানে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এসেছে। 'উলটপুরাণ', 'তৃতীয় দ্যূতসভা', 'দক্ষিনরায়, 'দ্বান্দ্বিক কবিতা', 'বদনচৌধুরীর শোকসভা,' 'পরশপাথর', 'রামরাজ্য', 'শোনাকথা', 'মাঙ্গলিক', 'জয়রামজয়ন্তী, 'গগনচটি', 'ভরতের ঝুমঝুমি', 'ভীমগীতা, 'গমানুষজাতির কথা', 'গন্ধমাদন বৈঠক' ইত্যাদি গল্পে পরশুরাম কোথাও রাজনীতিকে গল্পের বিষয় করেছেন আবার কোথাও রাজনীতির বিভিন্ন প্রসঙ্গের প্রতি তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। 'উলটপুরাণ' গল্পে ইংলন্ডে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপন করে ভারতীয়দের উপর ইংরেজদের অত্যচারের স্বরূপটি তুলে ধরেছেন অনেকটা প্যারডির মত করে। 'মহাবিদ্যা' গল্পে রাজনৈতিক নেতার নগ্নরূপ, 'দক্ষিণরায়' গল্পে রাজনৈতিক নেতার স্বার্থপরতা ও ভোটে জেতার জন্য রাজনৈতিক নেতার যে কোন উপায় অবলম্বন, 'দ্বান্দ্বিক কবিতা' গল্পে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার প্রয়োজনে ধর্মকে অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ এবং ভারতবাসীর স্বাধীনতা লাভ করার পরেও প্রকৃত স্বাধীন হতে না পারাকে ব্যঙ্গ করেছেন পরশুরাম। শুধু ভারতীয় রাজনীতি নয়, বিশ্বরাজনীতিকে নিয়েও যে পরশুরাম ভাবিত ছিলেন তাঁর বড় প্রমাণ 'গামানুষ জাতির কথা', 'গন্ধমাদন বৈঠক', 'তিন বিধাতা' ইত্যাদি গল্পগুলি। রাজনীতিকে বিষয় করে বাংলা সাহিত্যে খুব কম গল্পকারই এত গল্প লিখেছেন।

ত্রৈলোক্যনাথের গল্পগুলি পাঠ করতে করতে বাঙ্গালীর সঙ্গে এক গভীর আত্মার যোগ অনুভূত হয়। বাঙ্গালীর জীবন ও সমাজচিত্র নির্ভেজালভাবে তাঁর গল্পে উঠে এসেছে। তাঁর গল্পে সবটাই যেন বাঙ্গালীর রুচির গন্ধে সুবাসিত। এখন হয়তো অনেক কিছুই বাঙ্গালীর জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। বাঙ্গালীর সমাজ ও রুচির দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু দীর্ঘ পাঁচশ বছর ধরে যে রুচি বাঙ্গালী সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করেছে তার সম্পূর্ণ স্বাক্ষর রয়েছে ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে। বাঙ্গালী সমাজ ও বাঙ্গালী পাঠকের কাছে ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের একটি আলাদা আবেদন রয়েছে। পরশুরামের গল্পের ক্ষেত্রেও অনেকটা তাই। পরশুরামের গল্পেও বাঙ্গালীর জীবনচিত্র আছে। তবে মিশ্রণও সেখানে প্রচুর। বহু অবাঙ্গালী চরিত্র এবং তাদের রুচি পরশুরামের গল্পে যুক্ত হয়ে তাঁর গল্পকে বৈচিত্র্যমন্ডিত করে তুলেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে পরশুরামের গল্পকে খাঁটি বাঙ্গালীর আসর থেকে কিছুটা হলেও বঞ্চিত করেছে, অন্তত ত্রৈলোক্যনাথের তুলনায় তো বটেই। আর বনফুলের গল্প তো এসবের অনেক ঊর্ধ্বে। বনফুলের গল্পের আবেদন বাঙ্গালী অবাঙ্গালী নয় তাঁর গল্পের আবেদন বিশ্বজনের কাছে। তাঁর গল্পের আবেদন স্থান কালের অনেক ঊর্ধ্বে। কেননা সমসাময়িক সমাজচিত্রর থেকেও তিনি অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন মানুষের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম

অনুভূতির চিত্র অঙ্কণে। মানুষের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চারিত্রিক অসঙ্গতিও যে কতটা কৌতুকাবহ হতে পারে বনফুল তা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।

রাজশেখর ও বনফুল উভয়ের গল্পেই বহু অবাঙ্গালী চরিত্রেরা স্থান পেয়েছে। শুধু অবাঙ্গালী চরিত্র নয় প্রবাসী বাঙ্গালীদের চিত্রও সেখানে পাওয়া যায়। রাজশেখর প্রায় আঠারো বছর বিহারে কাটিয়েছেন। সেজন্য বিহারের মানুষ, পরিবেশ পরশুরামের কিছু কিছু গল্পে লক্ষ করা যায়। বিহারের পরিমন্ডল রক্তে না মিশলে 'ভূশন্ডীর মাঠে'র মত গল্প সৃষ্টি করা যায় না। আর অবাঙ্গালী চরিত্র হিসেবে 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পের গন্ডেরিরাম বাটপারিয়া, 'লক্ষ্মীরবাহন' গল্পের কৃপারাম, 'নিরামিষাশী বাঘ' গল্পের চৌধুরী রঘুবির সিং, 'আনন্দীবাঈ' গল্পের ত্রিক্রম দাস, এম. জুলফিকার খাঁ, কিষণরাম খোবানী, আনন্দীবাঈ প্রভৃতি চরিত্রের নাম উল্লেখ করা যায়। এছাড়াও পরশুরামের কিছু কিছু গল্প রয়েছে যে গল্পগুলির পটভূমি নির্মিত হয়েছে বাংলাদেশের বাইরে। যেমন 'নিরামিশাষী বাঘ' গল্পটি গয়া জেলার পটভূমিতে, 'দাঁড়কাগ' গল্পটি গণেশ মুন্ডার পটভূমিতে, 'আতারপায়েস' গল্পটি দেওঘরের পটভূমিতে নির্মিত হয়েছে। আর বনফুল তো তাঁর জীবনের একটি বড় অংশ কাটিয়েছেন বিহারে। সুতরাং বিহারের মানুষ, সেখানকার সংস্কৃতি এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব তাঁর রচনায় পড়বে সেটাই স্বাভাবিক। পড়েছেও। তাঁর বহু গল্পে বিহারের মানুষ, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা এসেছে। 'থিওরি অব রিলেটিভিটি' গল্পে রুকমিনিয়া, 'দুধের দাম' গল্পে বিহারী কুলি এবং গয়লানী বৃদ্ধা অথবা 'বুড়িটা' গল্পের বৃদ্ধা ভিখারিণী বৃদ্ধা তো বিহারের পটভূমিতেই নির্মিত চরিত্র। অন্যদিকে ত্রৈলোক্যনাথ বহুদর্শী লেখক হলেও বাংলাদেশের বাইরে তিনি সেভাবে তাঁর গল্পের পটভূমিকে বিস্তৃত করেননি। বাংলাদেশ, বাঙ্গালী আর ফ্যানটাসির জগৎ—এই নিয়েই ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর গল্পের ভূবন নির্মাণ করে নিয়েছেন।

ত্রৈলোক্যনাথ ও রাজশেখরের গল্পের একটি দিক কারোর নজড় এড়ায় না, এটি হল চিত্রের ব্যবহার। এদিক থেকে দুজনের মিল আছে। ত্রৈলোক্যনাথ ও রাজশেখর উভয়ই তাঁদের অনেকগুলি গল্পকে চিত্রযুক্ত করে পরিবেশন করেছেন। রাজশেখরের গল্পের ছবিগুলি তাঁর বন্ধু যতীন্দ্রকুমার সেনের আঁকা। কোনও সন্দেহ নেই এই ছবিগুলি রাজশেখরের গল্পকে একটা আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে। পরিমল গোস্বামী এই ছবিগুলি প্রসঙ্গে বলেছেন :

> ''রাজশেখরের গল্পের সঙ্গে যতীন্দ্রকুমারের ছবির অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ। ইংরেজি সাহিত্যে ডিকেন্স-এর বিখ্যাত চরিত্রগুলি যেমন শুধু লেখার ভিতর দিয়ে নয়, ছবির ভিতর দিয়েও পরিচিত হয়ে গেছে-মিস্টার পেকস্নিফ, বারনাবি রজ, স্মাইক, মিক'বার য়ুরায়া

হীপ, মিস্টার পিক উইক, স্যাম ওয়েলার ইত্যাদি। বাংলা-সাহিত্যে তেমনি পরশুরামের গন্ডেরীরাম, শ্যামানন্দ, নেপাল ডাক্তার, তারিণী কবরেজ, হাকিম সাহেব, নন্দ, বিপুলা মল্লিক, লম্বকর্ণ, লাটুবাবু, শাঁকচুন্নী, কারিয়া পিরেত, যক্ষ, নকুড়মামা প্রভৃতি ছবির ভিতর দিয়ে আমাদের প্রিয়তর হয়ে উঠেছে।''[৫৯]

রাজশেখরের গল্প থেকে কয়েকটি ছবির দৃষ্টান্ত :

শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড

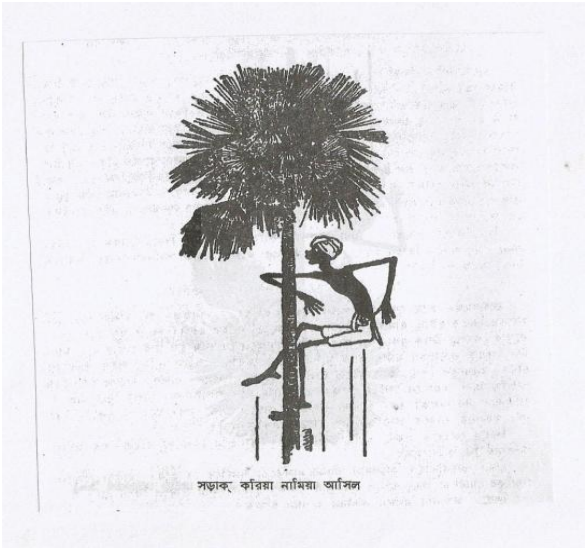

ভূশন্ডীর মাঠে

চিকিৎসা-সঙ্কট

ত্রৈলোক্যনাথের গল্প থেকে ছবির দৃষ্টান্ত :

বীরবালা

বনফুলের গল্পে এধরণের কোন ছবি যুক্ত হয়নি। আসলে বনফুলের গল্পে মানবচরিত্রের যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি তুলে ধরা হয়েছে তাঁকে কোন ছবিতে স্পষ্ট করা যায় না। হয়তো একারণেই বনফুলের গল্পে ছবির ব্যবহার নেই।

এরকমভাবে দেখা যায় এই তিনজন সাহিত্যিকদের মধ্যে নানা পার্থক্য রয়েছে। তবে সবথেকে বড় পার্থক্য রয়েছে তাদের লেখক স্বভাবে। সাহিত্যিকদের সাধারণভাবে দুটি দলে ভাগ করা যায়। একদলে আছেন যারা সাহিত্য রচনা করেন বিশেষ উদ্দেশ্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে। তারা মনে করেন "Literature is Criticism of life". আর একদল সাহিত্য রচনা করেন বিশেষ আনন্দবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে। প্রথম দলে পরেন সুইফট আর দ্বিতীয়দলে পরেন রবীন্দ্রনাথের মত সাহিত্যিকেরা। ত্রৈলোক্যনাথ, রাজশেখর ও বলাইচাঁদ এই তিনজন সাহিত্যিকই হাস্যরসিক শিল্পী কিন্তু শিল্পীস্বভাবের দিক দিয়ে বিচার করলে ত্রৈলোক্যনাথ ও রাজশেখরের স্থান প্রথম শ্রেণীতে। আর বনফুল পরেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে। সাহিত্যের আসরে বনফুলের স্থান চিরকালীন।

উল্লেখসূচি :

১) ক) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নবম খন্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০০২, পৃ.. ১০৩।
খ) বাংলার লেখক ও কবি, প্রমথনাথ বিশী, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, মাঘ ১৩৮৮, পৃ. ২২-২৩।

২) ক) ভবানী মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর, যষ্টিমধু, বৈশাখ ১৩৬৭, পৃ.৩০, উদ্ধৃত : পরশুরামের গল্পের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়, উজ্জ্বল গঙ্গোপাধ্যায়, পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর-২০১১, পৃ. ২৩২।
খ)সমগ্র স্মৃতিচিত্র, পরিমল গোস্বামী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, পৃ. ৫৬০।

৩) বনফুল, বিপ্লব চক্রবর্তী, সাহিত্য অ্যাকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজশাহ রোড,নতুন দিল্লি-১১০০০১, প্রথম প্রকাশ ২০০৫, পৃ. ২৭।

৪) ‘পশ্চাৎপট’, বনফুল, বাণীশিল্প, ১৪ এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, তৃতীয় সংস্করণ-২০১৪, পৃ. ১৮৯।

৫) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ ২০০১, পৃ.. ৭০৭।

৬) তদেব, পৃ. ৭০৭।

৭) রবীন্দ্র স্মৃতি, বনফুল, বাণীশিল্প, ১৪ এ টেমার লেন, কলকাতা-০৯, পৃ. ৭৩।

৮) 'মহেশের মহাযাত্রা', পরশুরাম গল্পসমগ্র।

৯) 'মড়াটা', বনফুল গল্পসমগ্র।

১০) বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র, বনফুল, ২য় খন্ড, পরিকল্পনা, প্রস্তাবনা ও সঙ্কলন : চিরন্তন মুখোপাধ্যায়, বাণী শিল্প, ১৪ এ টেমারলেন, কলকাতা ৭০০০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০০৫, প্রচ্ছদে উল্লিখিত।

১১) বনফুলের জীবন ও সাহিত্য, নিশীথ মুখোপাধ্যায়, বর্ণালী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৯শে জুলাই, ১৯৯৮, পৃ. ৩৮।

১২) তদেব, পৃ. ৩৯।

১৩) হনুমান সিং, বনফুল গল্পসমগ্র, পৃ. ৫২৩।

১৪) বাংলা ছোটগল্প, শিশিরকুমার দাশ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ. ১৪০।

১৫) বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার, শ্রীভূদেব চৌধুরী, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩,পঞ্চম প্রকাশ (নতুন সংস্করণ): ২০০৩ পৃ. ৬৫।

১৬) 'মুক্তামালা', ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০১২।

১৭) 'মূল্যবান তামাক ও জ্ঞানবান সর্প', ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০১২।

১৮) 'মুক্তামালা', শেষভাগ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০১২।

১৯) বাংলা ছোটগল্প, শিশিরকুমার দাশ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ. ১৩৮।

২০) পরশুরামের গল্প: দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়, উজ্জ্বল গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা-৯, পুস্তক বিপনি,

২৭ বেনিয়াটোলা লেন, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর- ২০১১, পৃ. ২১১-২১২।

২১) 'যা হয়', বনফুল গল্পসমগ্র।

২২) 'উপেক্ষিতা', পরশুরাম গল্পসমগ্র।

২৩) 'প্রচ্ছন্ন মহিমা', উদ্ধৃত: বনফুলের জীবন ও সাহিত্য, ড. নিশীথ মুখোপাধ্যায়, বর্ণালী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৯শে জুলাই, ১৯৯৮, পৃ.. ১১৫।

২৪) 'সমাধান', বনফুল গল্পসমগ্র।

২৫) 'আত্মপর', বনফুল গল্পসমগ্র।

২৬) 'এক ফোঁটা গল্প', বনফুল গল্পসমগ্র।

২৭) উদ্ধৃত: কালের পুত্তলিকা, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, কার্তিক ১৪০৬, নভেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ১৩৭।

২৮) বাংলার লেখক ও কবি, প্রমথনাথ বিশী, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, মাঘ ১৩৮৮ পৃ. ২৪।

২৯) 'লুল্লু', ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০১২।

৩০) প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। উদ্ধৃত: পরশুরাম গল্পসমগ্র, সম্পাদনা: দীপঙ্কর বসু, এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা- ৭৩, পৃ. ৮২০।

৩১) দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য: গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩, তৃতীয় সংস্করণ: ২০১০, পৃ. ৩০৬।

৩২) 'জটাধর বক্সী', পরশুরাম গল্পসমগ্র।

৩৩) 'জটাধর বক্সী', পরশুরাম গল্পসমগ্র।

৩৪) ভূমিকা, পরশুরাম গল্পসমগ্র, সম্পাদনা দীপঙ্কর বসু, এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা- ৭৩, পৃ. ২৪-২৫।

৩৫) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, পুনর্মুদ্রণ ২০০১, পৃ. ৩৯৬।

৩৬) ভূমিকা, প্রমথনাথ বিশী, পরশুরাম গল্পসমগ্র, সম্পাদনা: দীপঙ্কর বসু, এম.সি সরকার

অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা- ৭৩, পৃ. ১৮।

৩৭) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, পুনর্মুদ্রণ ২০০১, পৃ. ৭০৭।

৩৮) 'অজান্তে', বনফুল গল্পসমগ্র।

৩৯) 'অজান্তে', বনফুল গল্পসমগ্র।

৪০) অভিভাষণ, বনফুল, শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন ১৩৫৯।

৪১) অভিভাষণ, বনফুল, শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন ১৩৫৯।

৪২) 'ডানা', বনফুলের রচনা সমগ্র (পঞ্চম খন্ড), পরিকল্পনা, সম্পাদনা: বীতশোক ভট্টাচার্য, প্রস্তাবনা ও সঙ্কলন : চিরন্তন মুখোপাধ্যায়, বাণী শিল্প, ১৪ এ টেমারলেন, কলকাতা ৭০০০০৯, নভেম্বর ২০১২, উপন্যাসের শেষ কবিতার শেষ লাইন।

৪৩) বনফুলের ব্যঙ্গ কবিতা, নিতাই বসু সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩ জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ২০।

৪৪) 'মিঃ মুখার্জী', বনফুল গল্পসমগ্র।

৪৫) 'পাশাপাশি', বনফুল গল্পসমগ্র।

৪৬) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, পুনর্মুদ্রণ ২০০১, পৃ. ৭০৭।

৪৭) 'কশাই', বনফুল গল্পসমগ্র

৪৮) ক) বাংলার লেখক ও কবি, প্রমথনাথ বিশী, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, মাঘ ১৩৮৮ পৃ. ২১।

খ) বাংলা উপন্যাসে তির্যকদৃষ্টি, অর্ধেন্দু বিশ্বাস, গ্রন্থবিকাশ, সংস্করণ, জুলাই ২০০২, বামা পুস্তকালয়, ১১ এ-বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ.. ২৫৫।

৪৯) বাংলা উপন্যাসে তির্যক দৃষ্টি, অর্ধেন্দু বিশ্বাস, গ্রন্থবিকাশ, সংস্করণ, জুলাই ২০০২, বামা পুস্তকালয়, ১১ এ-বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ২৫৫।

৫০) বনফুলের ফুলবন, সুকুমার সেন, সাহিত্য লোক, ৫৭ এ কারবালা-ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা ৬, প্রথম প্রকাশ: দোল পূর্ণিমা ১৩৯০, সাহিত্যলোক, পৃ.১।

৫১) মৃন্ময়, বনফুল গল্পসমগ্র।

৫২) ভূমিকা, প্রমথনাথ বিশী, পরশুরাম গল্পসমগ্র, সম্পাদনা: দীপঙ্কর বসু, এম.সি সরকার

অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা- ৭৩, পৃ. ২২।

৫৩) ভূমিকা, প্রমথনাথ বিশী, পরশুরাম গল্পসমগ্র, সম্পাদনা: দীপঙ্কর বসু, এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা- ৭৩, পৃ. ২২।

৫৪) শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড, পরশুরাম গল্পসমগ্র, পৃ.১৭।

৫৫) 'লুল্লু', ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০১২, পৃ. ৩৫।

৫৬) বাংলার লেখক ও কবি, প্রমথনাথ বিশী, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, মাঘ ১৩৮৮ পৃ.১৭।

৫৭) বাংলা গল্প বিচিত্রা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশ ভবন, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, পৃ.১১।

৫৮) চতুর্থ গল্প, ডমরুচরিত।

৫৯) সমগ্র স্মৃতিচিত্র, পরিমল গোস্বামী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ২৮৫।